মধ্যপঞ্চাশ

মধ্যপঞ্চাশ

চাণক্য সেন

মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মধ্যপঞ্চাশ

এই বিশাল স্ফীতদেহ রাজধানী শহরে দুটি পরিবারে ভয়ানক উত্তেজনা।

সুনৃত মুখার্জি একটি পরিবারের কর্তা। ছোট পরিবার, সুনৃত, পত্নী অনুশীলা, কন্যা মিলি, অর্থাৎ মলয়া। সুনৃতের বয়স একত্রিশ, অনুশীলার পঁচিশ, মিলির চার। মাঝারি স্তরের হলেও সুনৃতের পদ কুলীন শ্রেণীর—গেজেটেড অফিসার, অর্থাৎ তার নিয়োগ, বদলি, ছুটি ইত্যাদি চাকুরি জীবনের সমূহ ঘটনা সরকারি গেজেটে ছাপা হয়। লম্বা মজবুত চেহারা, প্রশস্ত কপালের সামনের দিক এখনই বিরল-কেশ, বড় বড় চোখে, এঞ্জিনিয়র হলেও, খানিকটা স্বপ্নালুতা। পোশাক-পরিচ্ছদে দৃষ্টি সজাগ, তেমনি গৃহসজ্জায়।

অনুশীলা সুন্দরী নয়, কিন্তু দেখতে বেশ। মুখখানা গোল হতে হতে চিবুকের দিকে দুগালের চাপে আলতোভাবে সরু, তাই চিবুকে হঠাৎ অকারণ কোমলতা। সযত্নে প্রসাধন করলে বাঙ্গালী মাপে ফর্সা দেখায়। স্বামীর কাঁধ পর্যন্ত মাথা পৌঁছায়, সুতরাং বেঁটে নয়, দেহের গড়ন ভালো ছিল, সম্প্রতি মা হবার পর, পেটে মাংস জমেছে, চোলি পরলে নগ্ন কটিতটে তরঙ্গ দেখা যায়। অনুশীলা সুকেশী, সুদন্তী, সুস্তনা, সুরুচি। এবং সুবেশা।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে দিল্লীর হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা জনপদগুলির যেটা সবচেয়ে জনাকীর্ণ, সেখানে দেড়শো টাকায় আড়াইখানা ঘরে সংসার করার পর সুনৃত সরকারি বাড়ি পেয়েছে গোলমার্কেটের শিবাজী স্কোয়ারে। সরকারি চাকরির অন্যতম লোভনীয় অনুষঙ্গ সরকারি গৃহ-ভাড়া কম, ঘরের সংখ্যা বেশি, তা ছাড়া, বাড়িওয়ালার খেয়াল-খুশির ওপর চুনকাম মেরামত নির্ভর করে না।

তথাপি, বাড়ি পেয়ে সুনৃত ও অনুশীলা যতখানি খুশি হওয়া উচিত তা হয়নি। তার কারণ আছে। প্রথমত, বাড়িটা বড়ো

পুরানো, মেঝে ফেটে গেছে, দেয়াল স্যাঁতসেতে, দরজা-জানালা নড়বড়ে। বার্ধক্যে জর্জর। দ্বিতীয়ত, যে-পাড়ায় বাড়ি জুটলো সেটা প্রধানত কেরানী-পাড়া। সুনৃত গেজেটেড অফিসার, বাস করবে কেরানী-পাড়ায়, প্রতিবেশী হবে কেরানীর দল, স্বামী-স্ত্রী কারুর কাছে ব্যাপারটা সুস্বাদু লাগেনি।

কিন্তু না গ্রহণ করার পথও বন্ধ। যে বাড়িটায় পাঁচ বছর কাটলো, মিলির জন্ম হল, যার অঙ্গে অঙ্গে সুনৃত-অনুশীলার দাম্পত্য জীবনের মধুরতম বছরগুলির সজীব স্মৃতি, তাতে আর বাস করা চলে না। বাড়িওয়ালা অবসরপ্রাপ্ত রায়সাহেব চন্দ্রকিশোর চৌধুরী ভাড়া বাড়াতে যেমন উৎসাহী, সংস্কারে তেমনি উদাসীন ; বছরে একবার চুনকামও করেন না। বছর দুই হল নানা ছোট বড় ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সুনৃতের সম্পর্ক শীতল-যুদ্ধের কঠিন সর্বগ্রাসী দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। সুনৃত দোতলায়, রায়সাহেব একতলায় ; দু'পরিবারে কথাবার্তা বন্ধ ; বাড়িভাড়া পর্যন্ত সুনৃত ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়। রায়সাহেব কূটনীতিতে অতিশয় চতুর, শীতল-যুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা প্রধানত তাঁরই। বছর খানেক হল কোথা থেকে বাছাই করে এক অবিবাহিত ছোকরাকে "বর্ষাতি" অর্থাৎ ছাদের ঘরখানা ভাড়া দিয়েছেন, তার উৎপাতে অনুশীলা অস্থির হয়ে উঠেছে। অথচ এ উৎপাত এমন সুকৌশল, সুনিয়ন্ত্রিত যে হাতে-নাতে কিছু একটা ধরে হেস্ত-নেস্ত করবে তার সুযোগ সুনৃত এখনও পায়নি। তার ওপর তিনি আদালতের ভয় দেখিয়েছেন।

এমন সময় দপ্তরে হলদে খামে সরকারি বাসা প্রাপ্তির সুসংবাদ এলো।

সুনৃত বাড়িওয়ালার সুগঠিত উৎপাতের কাহিনী জানিয়ে অনুশীলার স্বাস্থ্যভঙ্গের 'প্রমাণ' দাখিল করে, বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি পাবার জন্যে সকরুণ আবেদন জানিয়েছিল। তাতে ক্ষান্ত না থেকে বুদ্ধি করে, উঁচু স্তরে তদ্বিরের ত্রুটি করেনি। সে জানত, ব্যক্তিগত নেকনজর ছাড়া সরকার নামক বিরাট মরুভূমিতে একবিন্দু কৃপাবারি জোটবার নয়। তাই চেষ্টার বাকি রাখেনি। শেষ পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করেছিল আশ্বাস পেয়ে যে, স্পেশাল বিবেচনায় বাসা সে

অনতিবিলম্বে পাবে।

সরকারি বাসা পাওয়া নিয়ে অনুশীলা অনেক কল্পনা-জাল বুনেছিল। আশা করেছিল, হাল ফ্যাসনের নতুন একটি ফ্ল্যাট পাবে সদ্যনির্মিত কোনও পাড়ায়, এক তলার ফ্ল্যাট। সামনে সবুজ লন, চারদিকে বাছাই বাছাই ফুলের সুন্দর বাগান। মেহ্‌ন্‌দি গাছের বেড়া উঠবে লন আড়াল দিয়ে। পছন্দমত পর্দা দিয়ে শোবার, বসবার ঘর সাজাবে অনুশীলা : কিনবে নতুন আসবাব, অন্তত একটা নতুন খাবার টেবিল, চারখানা চেয়ার, সাইডবোর্ড। তারপর সুনৃতকে ধরে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনাবে···। সমাজে নিশ্চিত স্থান করে নেবে অনুশীলা।

সুনৃত অবশ্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল বার বার আশার বলগা বেশি না ছাড়তে।

বলেছিল, "কোথায় কেমন বাড়ি দেবে কিছু বলা যায় না। আজকাল কেউ তার নিজের পর্যায়ে বাড়ি পায় না। দু'ধাপ, তিন ধাপ নীচে বাড়ি মেলে সুতরাং কল্পনাকে খুব বড় লাগাম দিয়ো না। হয়তো দেখবে এমন পাড়ায় বাড়ি দিয়েছে যেখানে সব ছাপোষা কেরানীর বাস। দুখানা পায়রার খুপরির মতো ঘর।"

অনুশীলা কিন্তু খুব একটা দমে যায়নি। কল্পনার লাগাম বেশ ভালই ছেড়েছিল।

সরকারি চিঠি যে-সুসংবাদ বহন করে আনল তার মধ্যে আশা-ভঙ্গের এমন বিস্বাদ বেদনা লুকিয়ে থাকবে অনুশীলা কখনও ভাবে নি। চিঠি খুলে সুনৃত দেখতে পেল বাসা সে পেয়েছে, তবে একেবারে সাবেকী কেরানী পাড়ায়, গোল মার্কেটের অনতিদূরে শিবাজী স্কোয়ারে।

সুনৃত সে জাতের লোক যারা সহজে দমতে চায় না, যাদের প্রশস্ত বুকে আশা চিরদিন ঝলমল করে। আধগ্লাস জলকে তারা বলে অর্ধ-পূর্ণ, অর্ধ-শূন্য নয়। যে-কোনও অবস্থার মধ্যে চকচকে কিছু আবিষ্কার করে নেয়।

"অনেক সুবিধে আছে পাড়াটার", হাঁড়ি-মুখ অনুশীলাকে সে বোঝাল। "মিলি যখন কনভেন্টে পড়বে, বাসে ওকে সাত সকালে

গিয়ে ভরা দুপুরে ফিরতে হবে না, আমি সকালে পেঁছে দেবো, দুপুরে তুমি নিয়ে আসবে, একেবারে হাতের কাছে স্কুল। আপিস, কনটপ্লেস সব নাগালের মধ্যে। সিনেমা যাবার সময় ঘণ্টাখানেক বাসের আপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পা অবশ করতে হবে না, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে। সবচেয়ে ভালো মাছের বাজার বাসার কাছে, আবার তেমনই বিড়লা মন্দির, কালীবাড়ি। ভৌগোলিক দিক থেকে মার্কেট পাড়ার মতো পাড়া নেই। খরচ অনেক কমবে, তবে, বাজার এত কাছে যে যা বাঁচবে, তুমি শাড়ী কিনেই তার দুর্ব্যবহার করে ফেলবে।"

অনুশীলার মুখে একটুকরো খুশি বুঝিবা দেখা যায়। কিন্তু ভয়ে, আতংকে, সে বলল, 'প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে কথা বলা যাবে না।"

"বোলো না।" আশ্বাস দিল সুনৃত। "যদি দেখতে পাও তারা আমাদের মেশবার অযোগ্য, মিশো না। তবে, হয়তো দেখবে, আমাদের মতো কক্ষচ্যুত আর কেউ কেউ ওখানে আছেন।"

"লোকের কাছে ঠিকানা বলতে পারবো না শুনে ভাববে তুমি বুঝি কেরানী।"

"যারা জানে তারা ভাববে না। যারা জানে না, তারা ভাবলে ক্ষতি নেই।"

"মামীমারা কখনো আমাদের বাড়ি আসবেন না।"

"আমরা আরও বেশি করে যাবো, তাহলে।"

মামীমা হচ্ছেন মিসেস শিখা লাহিড়ি। মিঃ অপূর্ব লাহিড়ি আই. সি. এস.-এর স্ত্রী।

"তুমি যাই বলো, বেশিদিন আমি থাকতে পারবো না ও-পাড়ায়। কেরানীদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার মন ছোট হয়ে যাবে। ইচ্ছেমতো সাজগোজ করতে পারব না।"

"এখন তো চলো। চেষ্টা করবো অন্য পাড়ায় উঠে যেতে, যদি তোমার ভালো না লাগে। ভালো লেগেও তো যেতে পারে!"

"না, পারে না। পারা উচিত নয়।"

বাসা দেখতে এসে অনুশীলার কান্না পেল।

শুধু যে জরা-জর্জর তাই নয়, তা না হয় চুনের প্রলেপে, মিস্ত্রীদের পরিশ্রমে, কিছুটা ঢেকে রাখা যাবে। সুনৃত এনজিনিয়র: সি. পি. ডব্লু. ডি-র বন্ধুদের বলে অনেক কিছু জোড়াতালি লাগিয়ে নিতে পারবে। অনুশীলার চোখে জল এলো মানুষগুলির প্রথম তিক্ত আস্বাদে। সিনেমা যাবার পথে বাসা দেখতে এসেছে, অনুশীলা সযত্নে সেজেছিল। তার চতুর্দিকে এমন সব অশ্লীল কৌতূহলী দৃষ্টি সমবেত হল যে সে বিব্রত, বিরক্ত বোধ করল। এক পাল ছেলেমেয়ে মাঠে খেলছিল, তাদের দেখে ছুটে এসে খানিক দূরে ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের কারুর বা ছেঁড়া প্যান্ট, কারুর বা হাতে কালি। যে-বাসা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট তার পাশে বারান্দার ঠিক নীচে খাটিয়া পেতে খালি-গা এক রুগ্ন বৃদ্ধ বিড়ি টানছিল মাঝে মাঝে। কুৎসিত কাশিতে ক্ষীণ শরীর তার এমন কাঁপছিল যে অনুশীলার প্রথম দৃষ্টিতে ভয় হল বুড়ো বুঝি তার চোখের সামনেই মারা যাবে। সুনৃত দরজা খুলছে, অনুশীলা দেখতে পেল, ডান পাশের বাসা থেকে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ সামান্য-খোলা দরজার ফাঁকে তাকে নিরীক্ষণ করছে।

সুনৃত এসব দেখল না। তার নজরে পড়ল বাসার সামনে সুন্দর বাগান-বিলাসের লতা ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। বেগুনি রং-এর বাগান-বিলাস তার সবচেয়ে পছন্দ। তি খানা ঘর। দু'খানা একেবারে ছোট নয়। মেঝে ক্ষয়ে গেছে, সারাতে হবে। দরজা-জানালা কিছু মেরামত করা দরকার। এসব করে নিলে বাসা মন্দ হবে না। পেছনের দিকে বেশ একটু উঠোন। ইট-বিছানো, কিছু ফুলবাগান করবার জায়গা আছে। সুনৃত পুলকিত হয়ে দেখল উঠোনের এক কোণে এক ঝাড় কলাগাছ। বড় বড় চকচকে সবুজ পাতায় স্নিগ্ধ বাল্যস্মৃতি। কলাগাছের পাশে অযত্নে ঝাঁক ঝাঁক নয়নতারা ফুটেছে। এগুলো সব কেটে সাফ করতে হবে। রজনীগন্ধার লাইন লাগাতে হবে উঠোনের দু-ধারে। বাছাই বাছাই গোটা দুই গোলাপ, ডালিয়ার ডজনখানেক পট, সুপরিকল্পিত কিছু মৌসুমী ফুল ; দাঁত-বার-করা

ইটের উঠোন বিচিত্র রং-এ সুচারু সৌরভে অপূর্ব সৌন্দর্যে সুনৃতের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

স্বামীকে অকারণ খুশি দেখে অনুশীলা নিজের গভীর অখুশিকে ঢাকতে চেষ্টা করল।

"মন্দ নয়, কি বলো!"—সুনৃত সোৎসাহে বলল।

"বড় পুরনো।" ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ করল অনুশীলা।

"সে আমি অনেকখানি নতুন করিয়ে নেব। করোলবাগে বছরের পর বছর ধুলো খেয়ে পেটে মরুভূমি জন্মেছে। এখানে সবুজ ঘাস আছে। উঠোনে সুন্দর বাগান করা যাবে। বাইরে বাগান-বিলাস দেখেছো?"

অনুশীলার সেই কুৎসিত-কাশি মৃত্যু-সম্মুখীন বুড়োর কথা মনে পড়ল।

"চারিদিকের লোকগুলো নোংরা।"

সুনৃত নালিশ কানে তুলল না।

"সরকারি বাড়ির সুবিধে হল, বাড়িওয়ালার উৎপীড়ন নেই, আদালতের হুমকি নেই, প্রতি বছর চুনকাম হবে, মেরামতের জন্যে এনকোয়ারি আপিসে টেলিফোন করে দিলেই, ব্যস। এ হচ্ছে চাকরির অধিকারে বাড়ি, নিজের উপার্জিত। ভাড়াও অনেক কম।"

অনুশীলা বুঝল, নালিশে, আপত্তিতে লাভ নেই। মাঝে মাঝে পুরুষ যে কত কঠিনভাবে দৃঢ়সংকল্প হতে পারে ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে সে তা খুব জেনে গেছে। অদ্ভুত জাত পুরুষগুলো। সবসময় তোমার কথা মেনে চলবে, যেন তোমার একান্ত অনুগত, অনুরক্ত। কিন্তু হঠাৎ এমন বিগড়ে যাবে, তখন শত চেষ্টায়ও তুমি তাকে পথে আনতে পারবে না। অনুশীলা জানে, বিগড়ানো সুনৃতকে ঘাটিয়ে লাভ নেই।

পরের রবিবারে সুনৃত-অনুশীলা-মিলির বাসা-বদল হল।

আরও একটি পরিবার একই দিনে শিবাজী স্কোয়ারে বাসা বদল করল।

ফিরোজপুরের চাষী ছিল রামচাঁদ, মাঝারি রকমের চাষী।

ছেলেদের গ্রামের পাঠশালায় পড়তে পাঠিয়েছিল। বড় ছেলে ত্রিলোকচাঁদ, ছোট ছেলে উত্তমচাঁদ। দুজনের মাঝখানে একটি কন্যা। ত্রিলোকচাঁদ পাঠশালার অন্তিম পরীক্ষায় চার টাকা জলপানি পেল। বাপ চেয়েছিল সামান্য লেখাপড়া শিখে চাষীর ছেলে চাষ করবে। জলপানি-পাওয়া সুপুত্র চাইল আরও পড়তে। অগত্যা ক্রোশখানেক দূরে মিডল্ স্কুলে তাকে পাঠাতে হল। সেখানে পাঠ সমাপ্ত করে ত্রিলোকচাঁদ ম্যাট্রিক পড়ার জিদ ধরল। বাপ এবার বেঁকে বসল। জোর করে ত্রিলোকচাঁদকে ক্ষেতের কাজে লাগাল। সে-কাজে তার মন নেই। কিছুদিন পরে রামচাঁদের দেহান্ত হল। বোনের শাদী হয়ে গেছে, সংসারে একা ত্রিলোকচাঁদ, বুড়ী মা, ছোট ভাই। উত্তমচাঁদ তখন গাঁয়ের স্কুলে পড়ে। ত্রিলোকচাঁদকে ছোটবেলা শহর ডেকেছিল, যেতে পারেনি। এবার সে ঠিক করল শহরে যাবে। গ্রামের অন্যান্য চাষীদের সঙ্গে জমির একটা চলনসই বন্দোবস্ত করল, যাতে মা-ভাই-এর খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়। পঁচিশ বছরের ত্রিলোকচাঁদ ফিরোজপুর শহরে এলো। তখন সে বিয়ে করেনি।

মিডল্ পাস বলে খানিকটা অহংকার ছিল, কিন্তু শহরে এসে দেখল তার কোন দাম নেই। অনেক ঘোরাঘুরির পর উচ্চপদস্থ এক রাজপুরুষের গৃহে কাজ পেল ত্রিলোকচাঁদ। ঠিক চাকর নয়, বেয়ারার কাজ। গাড়ি সাফ করা, সাহেবের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দেওয়া, এই সব। বাসের জন্যে আউট-হাউসে ঘর পেল, খাওয়া পেল, জামা-কাপড় পেল, তদুপরি কুড়ি টাকা মাইনে। তার কাজে কর্মে মনিব সন্তুষ্ট হলেন।

মনিবের যখন দিল্লীতে বদলির অর্ডার এলো, ত্রিলোকচাঁদকে তিনি সঙ্গে নিতে চাইলেন।

দিল্লী যাওয়ার আনন্দে ত্রিলোকচাঁদ মেতে উঠল। তাহলেও, আনন্দ চেপে নিজের ভবিষ্যৎটা একটু গুছিয়ে নেবার মতো ব্যবহারিক বুদ্ধি তার ছিল।

মনিবকে ত্রিলোকচাঁদ করজোড়ে নিবেদন করল, ফিরোজপুর তার গ্রামের কাছে, বুড়ী-মা আছে একা গ্রামে, দরকার হলে ছুটে যেতে

পারে। অবশ্য তার মানে এই নয়, গ্রামের বন্ধন সে কাটাতে পারবে না, কাটাতে চায় না। কিন্তু দিল্লীর মতো দূরদেশে গেলে খরচ বাড়বে, মাকেও বোঝাতে হবে, কোনও একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের সন্ধানে সে যাচ্ছে। হুজুর অতিশয় মেহেরবান, তাকে যদি চাপরাশির পদে বহাল করে দেন তাহলে তার একটা ভবিষ্যৎ হয়। সে মিডল্ পাস, প্রাইমারিতে চার টাকা জলপানী পেয়েছিল, সার্টিফিকেট তার সঙ্গেই আছে।

মনিব নিজেও ভেবেছিলেন সুকর্মী ত্রিলোকচাঁদকে পুরস্কৃত করেন। তাঁর দিল্লী যাওয়ার মাস দুই দেরি ছিল, যাঁর কাছে ভার দিয়ে যেতে হবে হঠাৎ তাঁর অসুস্থতার জন্যে। চাকরির মাহাত্ম্যে তিনি একজন ব্যক্তিগত অর্ডারলি পেয়ে থাকেন; যে-লোকটা সে-কাজে বহাল, সে ফিরোজপুর থেকে যেতে চাইছে না। দপ্তরে এক বেয়ারার পদ খালি ছিল, তিনি ত্রিলোকচাঁদকে নিযুক্ত করে নিলেন: দুজনকে ডেকে কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন, যখন তিনি দিল্লী যাবেন, সঙ্গে যাবে ত্রিলোকচাঁদ।

চাষীর ছেলে ত্রিলোকচাঁদ ভারত-সরকারের কর্মচারী হল। ভদ্রলোক হবার সোপান-শ্রেণীতে প্রথম পা ফেলল।

জীবনের এই সার্থকতা-মুহূর্তে আশ্চর্য আত্মশক্তির সন্ধান পেল ত্রিলোকচাঁদ! আউট-হাউসের অন্য একখানা ঘরে মনিবের ড্রাইভার উধম সিং সপরিবারে বাস করে। তার চতুর্দশী কন্যা হরদেঈকে ত্রিলোকচাঁদের ভালো লাগলো। ছিপছিপে গেহুঁ-রঙের পাতলা মেয়েটিকে দেখে ত্রিলোকচাঁদের বুকের মধ্যে কাঁপন জাগত; তার লালচে চুলের বিনুনীতে রোমান্সের রঙিন হিল্লোল দেখতে পেত। হরদেঈ প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে, সুতরাং শিক্ষিতা; নম্র স্বভাব, বড় বড় সামান্য-কটা চোখে সপ্রতিভতার আড়ালে মোলায়েম ব্রীড়া। উধম সিং-এর সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের ভাব জমেছিল বেশ, তার বিপুলদেহা পত্নীও তাকে পছন্দ করত। বছর খানেক আকারে-ইংগিতে হরদেঈকে সে তার রঙিন মনের পরিচয় দিয়েছিল। চিবুকে ঈষৎ অরুণাভা, অধরে মৃদু হাসিতে হরদেঈ তা স্বীকারও করে নিয়েছে।

উধম সিং-এর কাছে ত্রিলোকচাঁদ হরদেঈ-র পাণি প্রার্থনা করল।

ভারত-সরকারের আর্দালী, পাত্র হিসাবে সে লোভনীয়, লোকও ভালো, সুতরাং দশ দিন পরে, এক মুসলমান টংগা-ওয়ালাকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে, তার হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে কোনও মতে দেহ স্থাপন করে, ফুলের মালায় মুখমণ্ডল আবৃত করে, চুড়িদার-আচকানে সুশোভিত, কৃপাণ-ধারী ত্রিলোকচাঁদ উধম সিং-এর আলোকিত গৃহাঙ্গনে বেল ফুলের মালা বদল করে হরদেঈকে পত্নীরূপে গ্রহণ করল। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দুজনে গেল গ্রামে। বুড়ী মা বিয়েতে আসতে পারেনি।

মাস দুই পরে হরদেঈকে মার কাছে রেখে ত্রিলোকচাঁদ এলো দিল্লীতে।

এসব হচ্ছে দেশবিভাগের আগের কথা।

দেশ যখন বিভাগ হল, ফিরোজপুর এলো ভারতবর্ষে, সুতরাং ত্রিলোকচাঁদের পরিবারগত কোন ক্ষতি হল না। কিন্তু আত্মীয় রিস্তেদার অনেকে ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবে, তাদের এবং হিন্দু-শিখ জনসাধারণের ওপরে যে নির্মম হিংসার প্লাবন বয়ে গেল, তাতে ত্রিলোকচাঁদের রক্ত গরম হল। ১৯৪৮ সালে দিল্লীর প্রাচীন ঐতিহাসিক মাটিতে পুনরায় যখন ভারতবাসীর হাতে ভারতবাসীর নিধন-পর্ব অনুষ্ঠিত হল, ত্রিলোকচাঁদও বীরোচিত ভূমিকা গ্রহণ করল। জীবনে প্রথম নিজস্ব হৃদয়-তাপে দেশ নামক অচিন্তিতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি তার মনে জেগে উঠল।

স্বাধীনতা দিবসে, বহু লক্ষ নরনারীর সঙ্গে সে-ও লাল-কিল্লায় পতাকা-উত্তোলন-উৎসবে যোগ দিয়েছিল ; মিছিলে বেরিয়েছিল তিন-রঙা ঝাণ্ডা নিয়ে ; হরদেঈকে সঙ্গে করে সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে এসেছিল ইন্ডিয়া গেটে। কিন্তু ইংরেজের ভারতত্যাগে, দেশের নবজন্মে, তার মনে যে-টুকু উত্তেজনা এসেছিল তা বাইরেকার, বাইরের উৎসব, জৌলুশ, মিছিল, এ-সব থেকে ; অন্তরে সে স্বতঃস্ফূর্ত কোন তাপ অনুভব করেনি। বিদেশীর অধীনতা ফিরোজপুরের চাষীপুত্র ত্রিলোকচাঁদের মনে কোনদিন জ্বালা ধরিয়ে দেয় নি। বিদেশীর অপসারণ, অতএব, তার কাছে রহস্য থেকে গেছে, যার অর্থ সে বোঝে নি, মর্ম উপলব্ধি করেনি। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা

একেবারে অন্য ব্যাপার, এটা সে খুব সহজ ভাবে বুঝল, তার রক্ত গরম হল, মাংসপেশী কঠিন, অন্তর নির্দয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু-হত্যার পরিবর্তে ভারতবর্ষে মুসলমান হত্যা যে দেশপ্রেম, একথা কেউ তাকে বলে দেয়নি, দেবার প্রয়োজন হয়নি ; একথা নিজেই বুঝল, বুঝল তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানে, পূর্বপুরুষদের দেহ থেকে প্রবাহিত দেহের রক্ত-চাঞ্চল্যে।

প্রথম ধাক্কা খেল গান্ধিজীর হত্যার দিন। গান্ধিজীকে সে কোনদিন দেখেনি ; কেবল, সবার মতো, নাম শুনেছে। তাঁর আদর্শ, বাণী, কর্মপন্থার সঙ্গে কোনও পরিচয় তার ছিল না। বরং স্বাধীনতার পর পাকিস্তান সম্পর্কে গান্ধিজীর উদারতা, দুর্গত বিপন্ন মুসলমানদের প্রাণ ও মান রক্ষায় তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস উত্তপ্ত হিন্দু-মনিবের উগ্র প্রতিশোধ-পরায়ণতায় বিকৃত অর্থে তার কাছে দুর্বলতা ও মুসলমানপ্রীতি বলে মনে হয়েছিল। তথাপি গান্ধিজী যেদিন আততায়ীর হাতে মারা গেলেন, সেদিন রাত্রের এক বিচিত্র ঘটনায় ত্রিলোকচাঁদের মন বদলে গেল।

উত্তীর্ণ শীতের সন্ধ্যায় সে মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার সংবাদ রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ-জানুয়ারির ভয়ংকর শীত উপেক্ষা করে দলে দলে নরনারী রাস্তায় এসেছে বেরিয়ে। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ, হতভম্ব। ত্রিলোকচাঁদও এমনই লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনে অকারণ বিষাদ, বিষণ্ণ শোকার্ত বাতাবরণ থেকে সংক্রামিত। ঘুরতে ঘুরতে রাত কত এগিয়ে গেছে খেয়াল নেই। এক সময় নয়া দিল্লীর টাউন হলের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে উঠতে ত্রিলোকচাঁদের সম্বিৎ ফিরে এলো, ঘরে ফিরতে হবে। ঘর মানে তুঘলক ক্রিসেন্টে মনিবের বাড়ির আউট-হাউসে এক কামরা : যেখানে হরদেঈ আর তাদের একমাত্র কন্যা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ফেরবার পথে ইন্ডিয়া গেটের বিষণ্ণ অন্ধকার পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবার সময় ত্রিলোকচাঁদ দেখতে পেল ল্যাম্প-পোস্টের নীচে বসে এক বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কাছে এসে সে দাঁড়াল। ভাবল, হয়তো বুড়ীর কোনও বিপদ,

অথবা শোক, কিম্বা সে অনাথা।

ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "মাতাজি, তুমি কাঁদছ কেন। তোমার কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো ত্রিলোকচাঁদের দিকে। আধা-অন্ধকারে, ল্যাম্প-পোস্টের আলোয়, ত্রিলোকচাঁদ দেখল তার চুল সাদা, মুখে বয়সের ভাঁজ। ছেঁড়া উড়নির প্রান্তে চোখের জল বার বার মুছছে।

সে আবার প্রশ্ন করল, "মাতাজি, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেবো?"

বৃদ্ধা এবার কেঁদে উঠল সশব্দে। বলল, "কোন্ দুষমণ এমন কাজ করল, কোন্ কুকুরের সন্তান?"

ত্রিলোকচাঁদ তখনও বোঝেনি কার জন্যে বিলাপ করছে দরিদ্র জরাগ্রস্ত নারী। কিন্তু একটু পরেই বুঝল। বুঝে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বৃদ্ধার পাশে বসে দু-চার প্রশ্নে জানল, সে পাকিস্তানের বাস্তুহারা, মুসলমানের হাতে তার স্বামী ও বড় ছেলে মারা পড়েছে, তার মেয়ের সন্ধান নেই।

তার বিস্ময় শতগুণ বর্ধিত হল।

সে প্রশ্ন না করে পারল নাঃ "তবু, মাঈ, তুমি গান্ধিজীর জন্য কাঁদছ?"

বৃদ্ধা জবাব দিল, "কাঁদবো না বেটা? এমনভাবে গুলি করে তোমরা ওকে মারলে, কাঁদবো না?"

আর বসেনি ত্রিলোকচাঁদ। উঠে সোজা ঘরের পথ ধরেছে। কিন্তু মনে তার যে-ঝড় এবার উঠল তা মুসলমান-মারার প্রলয় হতেও ভয়ানক। এমন কি মহিমা একটা মানুষের, বার বার সে প্রশ্ন করল নিজেকে, যার জন্যে এই শোকাতুরা নারী, প্রতিহিংসার বিষ যার মনকে অহরহ জ্বালাতে পারত, রজনীর নিভৃত অন্ধকারে একাকী বিলাপ করছে?

এ-ঘটনায় ত্রিলোকচাঁদ বদলে গেল। সে শান্ত হল, স্থির হল। সন্ধ্যার আড্ডা ছাড়ল। কিছুদিন পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে যে শান্তি কমিটি তৈরি হল তার এক কর্মীকে ধরে স্বেচ্ছাসেবকের ফর্ম সই করল।

একদিন নিজের হাতে মুসলমান মেরেছিল, অন্যদিন প্রাণ দিয়ে মুসলমানের সেবা করল।

পরিবর্তন এখানেই ক্ষান্ত হল না। সবাই দেখল ত্রিলোকচাঁদ মানুষটা কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে বছর খানেক না যেতে সন্ধ্যাবেলা সে স্কুলে যেতে আরম্ভ করল। পাঞ্জাব সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত ক্যাম্প-স্কুল। দু'বছরে ম্যাট্রিক পাস করল। দপ্তরে তার কাজে মন বেড়ে গেল। রাত্রিতে টাইপ শিখল। মনিব তার ওপর আরও খুশি হলেন। তৃতীয় বছরে ত্রিলোকচাঁদ ভারত-সরকারের কনিষ্ঠ কেরানীবাহিনীতে স্বোপার্জিত ক্ষুদ্র স্থান পেল।

জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে আকাঙ্খা বেড়ে গেল ত্রিলোকচাঁদের। ক্যাম্প-কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করল। সঙ্গে সঙ্গে শর্ট-হ্যান্ড শিখতে লাগল। ইতিমধ্যে, মায়ের দেহান্ত হলে, ছোট ভাইকেও সে নিয়ে এলো দিল্লীতে। ভর্তি করে দিল পাহাড়গঞ্জে ডি. এ. ভি. স্কুলে।

স্বামীর জীবন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে হরদেঈ-ও বদলে গেল। তার পোশাক বদলাল, চাল-চলনও। নিজেও সে রোজগার করত 'মেমসাহেবদের' কাছ থেকে উল এনে শীতের জামা তৈরি করে, মাঝে মধ্যে ঘরের নানা খুচরো কাজকর্ম করে। সঞ্চিত টাকায় কিনল সেলাই-এর কল. বোনা ও সেলাই-এর ডবল-পথে রোজগার বেড়ে গেল। দেবর যখন এসে দিল্লী পৌঁছল, স্বামীকে হরদেঈ জানাল এবার আর আউট-হাউসের একখানা ঘরে বাস করা যায় না, সরকারি কোয়ার্টারের জন্য উঠেপড়ে লাগতে হয়।

কেরানী-চাকরি কমদিন হয়নি। বাসা পাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তথাপি ত্রিলোকচাঁদ তদ্বিরের ত্রুটি রাখল না। ১৯৪৮ সালে শান্তি-সেনার কাজ করে কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্নেহ সে অর্জন করেছিল। তাঁদের দু'জন এখন পার্লামেন্টের সদস্য। তাঁরা ত্রিলোকচাঁদকে একেবারে ভোলেননি। তাঁদের সুপারিশে এবং চেষ্টায় ত্রিলোকচাঁদ একদিন এস্টেট অফিস থেকে বহু-প্রত্যাশিত চিঠি পেল।

শিবাজী স্কোয়ারে চতুর্দশ নম্বর মোকান ত্রিলোকচাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে।

সবুজ বড় মাঠ। পদব্রজ মানুষ তার বুক চিরে মাটি-বার-করা রাস্তা বানিয়েছে এদিক-ওদিক চারটে। মাঠের কোথাও-বা অযত্নে সবুজ ঘাস বুনো পাহাড়ী ছাগলের দাড়ি ; কোথাও-বা ছেলেদের খেলার দৌরাত্মে শুষ্ক-প্রায়। মাঝামাঝি বিরাট একটা অর্জুন গাছ ; তার সুদীর্ঘ পল্লবিত শাখা আকাশ স্পর্শ করেছে।

মাঠের দক্ষিণ ও পশ্চিম ঘেরাও করে লাইন-দেওয়া সরকারি মোকান। সোজা একটানা নীচু বারান্দা, এত নীচু যে প্রায় মাঠের সঙ্গে মিশে-যাওয়া। বারান্দা ভাগ করে এক একখানা গৃহের সীমানা। প্রবেশপথের সামনে প্রত্যেক মোকানের নির্দিষ্ট বারান্দা। সিমেন্ট ফেটে মাঝে মাঝে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। বারান্দা আগলে রেখেছে, বাইরের দিকে একটানা পাতলা দেয়াল, প্রত্যেক মোকানের সামনে এক একবার আর্কের মতো ঢেউ খেলে গেছে, তাই দেখে বুঝতে হবে এক এক গৃহের সম্মুখ-সীমানা।

বারান্দার সঙ্গে প্রবেশ দরজা। খুললে যে ঘরখানার পূর্ণ আকাশ তার দেয়ালের নীচু অংশ মাটির জলীয় সংস্পর্শে স্যাঁৎসেতে। সস্তা মেঝে ফেটে চৌচির। ঠিক চতুষ্কোণ নয়, ঘরখানা উত্তরে দক্ষিণে বেশ একটু বাঁকা। কিন্তু ফায়ার-প্লেস আছে, মাথার ওপর মরচে-পড়া বিজলী পাখা।

এখানা বাইরের ঘর।

বাঁ দিকে শোবার ঘর। একটু বড়ো, তেমনি স্যাঁৎসেতে, দুটো জানালাই নড়বড়ে, ছোট্ট ছোট্ট জানালা, লোহার শিক-লাগানো। শোবার ঘরের পরে এক চিলতে করিডর ; তার পাশে অন্ধকার রান্নাঘর, চামচিকে, আরশুলা ইঁদুর ইত্যাদির সংমিশ্রিত এক রাসায়নিক সুবাস। অথচ রান্নাবান্না, বাসন-ধোওয়ার বন্দোবস্ত বেশ ভালো। রান্নাঘরের সামনে ছোট বারান্দা। তার পরে তৃতীয় ঘর। অপেক্ষাকৃত ছোট ও আলোহীন, তাহলেও ব্যবহারযোগ্য। তৃতীয় ঘরের সংলগ্ন স্টোর। জানালা নেই, একেবারে অন্ধকার। কিন্তু আলো জ্বাললে বেশ। প্রায় রান্নাঘরের মতোই বড়, ইট-সিমেন্টের তাক করা আছে চাল-ডাল-তেল- নুন সব রাখবার জন্যে, তা ছাড়া, যেটুকু স্থান আছে প্রয়োজন হলে (অনুশীলা ভাবল) চাকরকে শুতে

দেওয়া যায়, অথবা (হরদেঈ ভাবল) দরকার মতো তৃতীয় ঘরখানার সঙ্গে মিলিয়ে কাউকে ভাড়া দেওয়া যায়।

এই হল শিবাজী স্কোয়ার।

একই রবিবারে এক বাঙ্গালী পরিবার ও আর একটি পাঞ্জাবী পরিবার শহরের দুই মহল্লা থেকে শিবাজী স্কোয়ারে সরকারী পাড়ায় নতুন করে ঘর পাততে এলো।

সুনৃত-অনুশীলার মালপত্র এলো লরি-বোঝাই হয়ে। টুক-টাক বেশ কিছু আসবাব অনুশীলা সংগ্রহ করেছিল ঃ দুখানা একক-শয্যা পালঙ্ক, মিলির জন্যে ছোট চৌকি, অনতিদামী সোফা-সেট, বুক-কেস, আলনা, কাঠের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, মিট-সেফ, খান দু' এক বসবার জলচৌকি, চারটে মোড়া। তার সঙ্গে বাক্স, বাসন, বিছানা, শিশি-বোতল, মসলার কৌটো, জলের সুরাই, মাদুর, সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সুনৃতের বইপত্র, সাইকেল, মিলির ছেলেবেলার প্র্যাম, বর্তমানের তিন-চাকা সাইকেল, একরাশি খেলনা, সুনৃতের সংগৃহীত দু'খানা মন্দ-নয় তৈলচিত্র, অ্যাশ-ট্রে, তিনটে পিতলের ফুলদানি,—অর্থাৎ সুনৃৎ-অনুশীলার জীবনযাত্রা যে কেবলমাত্র জৈব নয় তার প্রমাণস্বরূপ যা-কিছু সব এলো লরি বোঝাই করে।

লরির সঙ্গে এলো সুনৃত নিজে, ড্রাইভারের পাশে বসে, আর তার একজন সহকর্মী, দপ্তরের দু'জন চাপরাশী।

অনুশীলা, সকন্যা আলাদা এলো ট্যাক্সি চেপে! সঙ্গে সযত্নে নিয়ে এলো চীনা মাটির বাসন, গৃহসজ্জার কিছু বাছাই দ্রব্য, গহনা, টাকা-পয়সা।

লরি বিকট শব্দ করে দাঁড়াতে পাড়া-পড়শীর দিবা-নিদ্রা বা বিশ্রাম ভঙ্গ হল : অনেকে বেরিয়ে এসে দেখল নতুন প্রতিবেশীর আগমন : ছেলেমেয়ের দল মাঠে খেলা ছেড়ে সাত নম্বর কুঠির সামনে ভিড় জমাল।

অনুশীলার ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে প্রতিবেশীদের কৌতূহল অনেক বেড়ে গেল। সকাল থেকে সংসার তুলতে অনুশীলা ক্লান্ত : নতুন গৃহে ঢুকেই সংসার পাতার পরিশ্রমে নেমে যেতে হবে, তাই সে

সাজেনি মোটেই, শুধু মোটা তাঁতের ব্লাউজ ও পাতলা সবুজ রং-এর তাঁতের শাড়ী ভাঁজ ভেঙে পরেছে, সামান্য পাউডারের প্রলেপ দিয়েছে মুখে, গলায়, কাঁধে : মাঠের দুপুরের কড়া রোদ, নতুন পাড়ার মানুষগুলির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে চোখে কালো চশমা এঁটেছে। চুল বেঁধেছে টেনে শক্ত করে, গহনা প্রায় পরেই নি, শাড়ী-ব্লাউজ কাঁচুলিতে আট-সাঁট যুদ্ধে-নামা ভাব।

ট্যাক্সি বিদায় দিয়ে সোজা বারান্দায় উঠে এসে অনুশীলা দেখল সুনৃত ইতিমধ্যে মালপত্র প্রায় নামিয়ে নিয়েছে। বড় বড় আসবাব-গুলি নির্দিষ্ট ঘরে পাতিয়েছে। অনুশীলা বারান্দায় ফিরে এসে মজুরদের সাবধান করতে করতে দেখতে পেল বিশ-ত্রিশ জোড়া মনুষ্যনেত্র তার দেহের ও মুখের ওপর অসংকোচে বিচরণ করছে। বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করবার উপায় নেই, সময়ও নেই। এক পাল ভিড়-করা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে মিলিকে দূরে রাখা আপাতত কর্তব্য ; অনুশীলা কন্যাকে কাছে ডেকে, হাত ধরে রইল।

এক সময় মিলি বলে উঠল, "মা দেখ, আরও লোক বাসা বদলে এসেছে।"

অনুশীলা তাকিয়ে দেখল তাদের বাসা যে-লাইনে, তার শেষ কোয়ার্টারের সামনে এসে থামল টঙ্গা, সহিস গাড়ি থেকে নেমে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে বাহবা দিল, সাবাস বেটা, সাবাস। টঙ্গা বোঝাই চারটে বাঁশ-ও-দড়ির খাটিয়া, দুটো প্রকাণ্ড কালো টিনের বাক্স, দু'খানা চেয়ার, কিছু বাসনপত্র, একটা ছোট টেবিল, আরও ঘরকন্না, সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র। সঙ্গে দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। একরাশি ময়লা বিছানা।

মনে মনে অনুশীলা বলল, সাবাসই বটে।

খানিক পরে রাস্তা থেকে পায়ে-তৈরি পথ বেয়ে এলো সাইকেল। সাইকেলে মাঝবয়সী পুরুষ, তার কি-জানি-কি বয়সী স্ত্রী, কোলে একটি শিশু ; পেছনের সিটে সুটকেস, সামনে কিছু কাপড়-জামার বোঁচকা, আর—কি আশ্চর্য—আস্ত একটা খাটিয়া সোজা-সুজি ব্যালান্স করে বসানো। সাইকেল যে পুরো এক টঙ্গার মাল বইতে পারে অনুশীলার আজ প্রথমে নজরে পড়ল।

মিলি বলে উঠল, "মা, ওরা আর আমরা একদিনে বাসা বদলালাম কেন ?"

অনুশীলা এ-প্রশ্নের জবাবে মনে মনে অনুচ্চারিত, নিরুত্তর আর একটা প্রশ্ন করল ঃ "ওরা আর আমরা মরতে এক পাড়ায় একই রকম বাসা পেলাম কেন ?"

উনিশ শ' এগার সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক হল, তখন থেকেই ভারতের ইতিহাস-মুখরিত প্রাচীন রাজধানীতে ইংরেজ-গৌরবের চিরোজ্জ্বল স্মৃতিবাহক মহানগরী নির্মাণের পাঁয়তারা শুরু হয়েছিল। দেড়'শ বছর ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে, কিন্তু মনোমত কোনও শহর গড়বার সুযোগ ও সুবিধে হয়নি। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ তৈরি হয়েছিল বণিক ইংরেজের হাতে, তাতে শাসক ইংরেজের মন ভরেনি। শাসক-ইংরেজ চূড়ামণি লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে ইংরেজকে 'মুঘল-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখবার স্বপ্নে মেতে উঠেছিলেন; সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ করে যে বিরাট দরবারের আয়োজন করেছিলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের প্রতিভূ হিসাবে নিজেকে 'মুঘল শাহন্‌শার', ভূমিকায় অবলোকন করা। সে-উদ্দেশ্য কার্জনের সার্থক হয়েছিল। বণিক আমলের ইংরেজরা ছিল নবব, কার্জন আমলের ইংরেজ হল নববের নবাব্‌ শাহ্‌নশাহ্‌।

দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে আনবার প্রস্তাব ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা জল্পনার সৃষ্টি হল, তার মধ্যে মহানগরীর ভাবী স্থাপত্যরীতি অন্যতম। অনেক উত্তেজিত বিতর্কের মধ্যে দেখা গেল দুটো প্রধান মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একদল পারদর্শী বলতে লাগলেন লোকায়ত ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হোক ইংরেজের তৈরি রাজধানী শহরে। এ মতের পুরোধায় দেখা দিলেন হ্যাভেল, রোদেনস্টাইন, কুমারস্বামী। আর একদল পারদর্শীর মত হল ভারতীয় নির্মাণ-শিল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করা ইংরেজের পরম গৌরব মুহূর্তে অবাঞ্ছনীয়। এ-মতের পুরোধায় দেখা দিলেন সুবিখ্যাত ইংরেজ স্থাপত্য-শিল্পী স্যার এডুইন ল্যুটিনস্‌; তাঁকে

সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন দেশী-বিদেশী রাজভক্তের দল। অনেক বিতর্কের পর, রাজনৈতিক কারণে, ভারতীয় রীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব বড়লাট ও ইংরেজ সরকার নাকচ করে দিলেন। ইংরেজ যখন মহানগরী গড়বার সংকল্প নিয়েছে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বদেশ-প্রেমী ভারতবাসী তখন অহিংস অসহযোগ সংগ্রামে অবতীর্ণ।

এডুইন ল্যুটিনস্‌ যে-মহানগরী গড়লেন তাতে কোনও স্থাপত্য-রীতিই স্থান পেল না। না য়ুরোপীয়, না হিন্দু, না ইসলাম। বহু অর্থ ও দম্ভে তৈরি হল নতুন দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র—বড়লাট-প্রাসাদ, সেক্রেটারিয়েট ও তার সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ, অলীক ঝরনায় সুশোভিত, গ্রেট প্লেস—বিজয় চৌক। সেন্ট্রাল ভিস্টার শেষপ্রান্তে ইন্ডিয়া গেট, কাছাকাছি পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর শুভ্র-শ্বেত প্রস্তরমূর্তি। রাজস্থান থেকে বাছাই করা লাল পাথরে যে বড়লাট প্রাসাদ ও মহাধিকরণ তৈরি হল তাতে পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও মুসলমান স্থাপত্যের এমন এক জগাখিচুড়িরূপ প্রকাশ পেল যার অবাঞ্ছিত প্রভাবে স্বাধীন ভারতের রাজধানীতেও নতুন, মৌলিক স্থাপত্যরীতি গ্রহণের পথ অবরুদ্ধ হল।

স্থাপত্যরীতির কোনও চালু নিয়মই এডুইন ল্যুটিনস্‌কে মানতে হয়নি। তাঁকে গড়তে দেওয়া হল মানুষের বসবাসের জন্য মহানগরী নয়, ইংরাজের সাম্রাজ্য মহিমার প্রতীক এক দাম্ভিক, গর্বিত স্মৃতিসৌধ। এই সপ্তম দিল্লীতে স্থানাভাব ছিল না, বসতি বিরল কয়েকখানা গ্রামে গড়ে উঠল বিভব-পুরী। নগরীর মধ্যমণি হল বড়লাট ভবন ও মহাধিকরণ, সাম্রাজ্য-শক্তির কেন্দ্রস্থল। রাস্তাগুলি এমনভাবে তৈরি হল যাতে সংক্ষিপ্ত পথে যাতায়াত চিরতরে অসম্ভব হতে পারে। পাশ্চাত্য স্থাপত্যরীতিতে স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে ল্যুটিনস্‌ তার ওপর মুঘল স্থাপত্যের প্রতীক ইতস্তত জোড়া লাগিয়ে দিলেন। যা তিনি তৈরি করলেন তার মূল বার্তা হল, তোমরা দেখে নাও, সাম্রাজ্য-গর্বে আমি কত উন্নতশির, কী স্ফীতদেহ!

নতুন দিল্লীর যা কিছু, বড়লাট-ভবনকে কেন্দ্র করে। বড়লাটের শিকারের জন্যে রীজে বিস্তীর্ণ জঙ্গল সংরক্ষিত হল। যাতে তিনি

স্বল্পায়াসে ভগবান যীশুর উপাসনা করতে পারেন, সেজন্যে তৈরি হল ভাইসরয়ের চার্চ, লাটভবনের কাছেই। প্রাসাদ থেকে যাতে তিনি দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যমহিমা অনুক্ষণ অনুভব করতে পারেন, সেজন্যে নির্মিত হল দ্য' গ্রেট প্লেস। প্রাসাদের সংলগ্ন বিরাট উদ্যানের নাম দেওয়া হল মুঘল গার্ডেন্স।

ভাইসরয় ও মহাধিকরণ নির্মাণ করে বোধকরি ইংরেজের দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই, আর যা-কিছু নির্মিত হল তাতে স্থাপত্য-সৌন্দর্যের বালাই রইল না। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা উঠল প্রধান সেনাপতির জন্যে, রেস-কোর্সের কাছাকাছি, বড়লাট-প্রাসাদের সঙ্গে যে-সব বাংলো তৈরি হল, বিস্তীর্ণ ও পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা সত্ত্বেও তাদের স্থাপত্যরীতি কদর্য। কিন্তু ইংরেজের হাতে তৈরি অসুন্দরেরও এমন প্রভাব যে নির্দিষ্ট-এলাকায় দেশীয় নৃপতিদের অট্টালিকা অথবা অর্থবান মানুষের গৃহগুলি পর্যন্ত তাকে নকল করে কদাকার রূপ ধারণে পরিতুষ্ট।

বড় মানুষদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করার পর মহানগরীর নির্মাতাদের মনে পড়ল ছোট মানুষদের কথা। মনে পড়ল, যারা ছাপোষা কেরানি, সামান্য-বিত্ত, স্বল্প-সীমিত যাদের কল্পনা, উচ্চাশা, তাদেরও বাসা চাই, আস্তানা চাই।

এ-আস্তানা গড়বার ভার পড়ল সরকারি নির্মাতাদের ওপর। তারা অনেকেই এদেশীয়। যা তৈরি হল তা ঘরবাড়ি নয়, সারি সারি মনুষ্য-শালা। তাতে কোন স্থাপত্যরীতি নেই, আছে স্বল্পতম ইট, চুন, সিমেন্ট, সবচেয়ে সস্তা কাঠ, নিম্নতম কল্পনা বা সৌন্দর্য-বোধ। পর-পর গায়ে গা-লাগানো কোয়ার্টার, কোনটার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই, যেমন নেই কেরানির। সামনে অবশ্য উন্মুক্ত উদার মাঠ আছে, আছে সবুজ ঘাস, ঊর্ধ্বে খোলা আকাশ। বাসার জানালা-দরজায় আলো যদি বা কম আসে, পেছনে ছোট উঠোন আছে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, তাতেই কেরানি পরিবারের আলো-হাওয়ার চাহিদা মিটবে। কলকাতা বা বোম্বাই শহরের অন্ধকার প্রাচীন পল্লীর আলো-বাতাস-বঞ্চিত গৃহগুলির সঙ্গে এসব কেরানি-শালার তুলনা হয় না। কলকাতার সঙ্গে সেই প্রাচীন দম-রোধ করা বাড়িগুলোর

অস্বস্তিকর মিল আছে : কলকাতা মহানগরীর মহিমা লাটভবন বা রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ অভিব্যক্ত নয়। কিন্তু নয়া দিল্লীর নির্মাতাগণ পরিকল্পিত পথে নগরীর যে-বৈভব-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, পরিকল্পিত পথেই তার সঙ্গে চরম দূরত্ব দেখিয়ে, তৈরি করলেন সাধারণ মানুষের জন্যে কুৎসিত, কদর্য, দীন পল্লী। এ-অসুন্দর দারিদ্র্য যেটুকু কোমল হল তা কেবল প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে।

সুনৃত-অনুশীলা নতুন সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। সরকারি মিস্ত্রি ডাকিয়ে সুনৃত ভাঙা দরজা জানালা মেরামত করিয়েছে, মেঝের ফাটল বুজিয়েছে, উঠোনের পুরানো ভাঙা ইট তুলিয়ে নতুন চকচকে লাল ইট পাতিয়েছে। আসবার আগেই চুনকাম করিয়ে নিয়েছিল, এখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সযত্নে ঘষে মেজে গৃহে নতুনত্বের প্রলেপ লাগিয়েছে। পুরানো গাছ-গাছড়া অনেক বর্জন করেছে সুনৃত : নার্সারী থেকে এনে লাগিয়েছে রজনীগন্ধা, বেল, চামেলী, গোলাপ। শীতে লাগাবে বাছাই বাছাই মৌসুমী ফুল, তার জন্যে জায়গা তৈরি হয়েছে। জানালা-দরজায় সুরুচি পর্দা টাঙিয়েছে অনুশীলা, বিছানায় শোভন কভার। আসবাবপত্র সাজিয়েছে সুরুচিসম্মত কায়দায়, যাতে ঘরের দারিদ্র্য কম চোখে পড়ে। বসবার ঘরের মেঝেটা শত চেষ্টা করেও বার্ধক্যের জরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই অনুশীলা একজোড়া নকশাকাটা পাঞ্জাবী সতরঞ্চি দিয়ে তাকে মুড়ে দিয়েছে। এত যত্নের ফলে গৃহস্থালীর চেহারা অবশ্যই অনেক সুবেশ সুভদ্র হয়েছে। বসবার ঘরে সোফায় গা এলিয়ে রেডিওয় সেতার শুনতে শুনতে ন্যায্য পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুপুরবেলা অনুশীলা ভাবছিল, মামীরা যদি আসেন, একেবারে নাক সিঁটকাবার মতো এমন কিছু দেখতে পাবেন না।

সুনৃত আপিসে গেছে। সাত মিনিটে অনায়াসে সাইকেল করে সুনৃত দপ্তরে পৌঁছে যায়। বাসের মাইল-দীর্ঘ-কিউ-তে আধঘণ্টা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। ফলে, অনুশীলা সকালে নিঃশ্বাস ফেলার একটু সময় পায়। স্বভাবে সে একটু শয্যাবিলাসী। সকাল বেলা যতটুকু সময় বিছানায় শুয়ে থাকা যায় ততটুকু তার নিবিড়

আনন্দ। সুনৃত অনেক ভোরে ওঠে। তার উষাকালীন ব্যায়াম আছে। ব্যায়াম সেরে একটু বেড়িয়ে আসে। করোলবাগে বেড়িয়ে ফেরবার পথে দুধ নিয়ে আসত, এখানে অমন পাড়ার বুকের মধ্যে গো-মহিষশালা নেই, তাই কেভেন্টারের দুধ নিতে হচ্ছে। ফিরবার পথে সুনৃত গোল মার্কেট থেকে মাছ আনে। সে ফিরে এলেও, এখন অনুশীলাকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। সুনৃত এসে স্নানের ঘরে ঢোকে। সঙ্গে নেয় সংবাদপত্র। অনুশীলা জানে আধঘণ্টার আগে সে বেরুবে না। মিনিট কুড়ি বিছানায় আরাম করে অনুশীলা ওঠে। সুনৃত স্নান সেরে এসে চা চাইবে। তখন দেরি হলে যাবে রেগে।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজী "কাহার" এসে বাসন মেজে, ঘরদোর ঝাড়ু লাগিয়ে, রান্নাঘর সাফ করে গেছে। অনুশীলা কেরোসিনের স্টোভ জ্বালায়। সচরাচর সে কয়লা ব্যবহার করে না। সুনৃত তাকে তিনটে স্টোভ কিনে দিয়েছে, একটা প্রাইমা, অন্যটা জনতা, তৃতীয়টা বিজলীতে চলে। তাছাড়া অনুশীলার কুকার আছে, প্রেশার কুকার আছে, হট্-প্লেটও। চাকর সে রাখে না। একে তো ভালো চাকর পাওয়া যায় না, বছরে তিন-চারবার বদলাতে হয়; তার ওপর সুনৃতের সঙ্গে সে একমত, চাকর-বিলাসিতা মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিসর্জন দেবার সময় এসে গেছে। বয়স্ক চাকর রাখতে অনুশীলা ভয় পায়; ছোকরা চাকরদের টিঁকিয়ে রাখা যায় না। স্বভাবে সে একটু খুঁতখুঁতে, নিজের পছন্দমত কাজ না পেলে রেগে যায়, সহজে কিছু পছন্দও হতে চায় না। তাই চাকর সে রাখে না। দৈহিক পরিশ্রম কমিয়ে নেবার ব্যবস্থা যথা সম্ভব করে নিয়েছে অনুশীলা। রান্নাঘরে স্টোভ ও কুকার সাজিয়েছে; বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ আহার অভ্যাসকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে। করোলবাগে, মাদ্রাজীদের দেখাদেখি, মাঝে মাঝে সেও বাড়ির কাছে হোটেল থেকে টিফিন-ক্যারিয়ারের দু'বাটি ভর্তি করে ভাত নিয়ে আসত, রাত্রে আর ভাত রান্নার দরকার হত না। কিম্বা, পাঞ্জাবীদের মত, আটা পাঠিয়ে দিত, তন্দুরী রুটি তৈয়ারির দোকানে; দু আনা পারিশ্রমিকে প্রয়োজন মত চমৎকার রুটি পেয়ে যেতো। দোকান থেকে নানা রকম খাবার

আনিয়ে নিত সুনৃতকে দিয়ে মাঝে মধ্যে। নতুন বাড়িতে এসে এসব সুবিধেগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। তাই বিকেলে অনুশীলা কুকারে রান্না চাপিয়ে দেয়। রাত্রির আহার স্বল্পায়াসে সাধিত হয়।

অনুশীলা আয়েসী, কিন্তু অলস নয়। নিজের ও মিলির সব জামা সে নিজে সেলাই করে। স্বামীর অন্তর্বাস ও পায়জামাও। শীত পড়বার আগেই তার বোনা শুরু হয়। প্রত্যেক শীতে সে নিজে ও তার স্বামী-কন্যা উলের নতুন জামা পড়ে। তা ছাড়া, শৌখিন সেলাই-এ তার উৎসাহ। সময় পেলে টেবিল ক্লথ থেকে রুমাল পর্যন্ত কিছু না কিছু সে তৈরি করে।

বিয়ের আগে বেহালা শিখেছিল, মাঝে মাঝে তার চর্চা করে। মিলিকে এখন থেকেই ইংরেজী বাংলা ছড়া শেখায়। সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' থেকে মিলি তিন-চারটে ছড়া গড়গড় করে বলে যেতে পারে।

অনুশীলা যে অলস নয় সপ্তাহমাত্র সময়ে নতুন বাসগৃহের অঙ্গসজ্জা তার প্রমাণ। আজও, দুপুরবেলা, সুনৃত যখন দপ্তরে আর মিলি নিদ্রিত, অনুশীলা ঘণ্টাখানেক মাত্র বিছানায় শুয়ে বসবার ঘরে এসে বসেছে, রেডিওর একটা নতুন ঢাকনা করবার প্রয়োজনে। সুন্দর হালকা পদ্মরঙের মোটা সিল্কের কাপড় কিনে এনেছে, 'উয়োম্যান অ্যান্ড হোম' থেকে মনোরম প্যাটার্ন তুলবে। রেডিওর মাপ নিয়ে কাপড়ে দাগ দিয়ে একটু অন্য মনেই অনুশীলা রেডিও খুলেছে, পরিচিত সুরে সেতারের ঝংকার সোফায় গা এলিয়ে শুনছে, আর এক সঙ্গে, ঘরখানার শোভিত অঙ্গে চোখ বুলিয়ে ভাবছে, মামীরা এলে নাক সিঁটকানোর মত বড় একটা কিছু পাবে না।

এমন সময় দরজায় মৃদু অঙ্গুলি-আঘাত পড়ল।

হুট করে দুপুরবেলা দরজা অনুশীলা নিশ্চয় খুলবে না। তাই প্রশ্ন করল, "কোন্?"

স্ত্রী-কণ্ঠে জবাব এলো, "বহিন্‌জি, আমি। আপনার পাশের বাড়ির লোক।"

ধস্ করে উঠল অনুশীলার বুক। সাতদিন ধরে এ-ভয় সে পুষে রেখেছে। ওরা আসবে, আসবেই ওরা, ঐ সব হাঁ-করা চোখে-

গেলা অসভ্য মানুষগুলি, আসবে প্রতিবেশীর দাবি নিয়ে আলাপ করতে, ভাব জমাতে, সই পাতাতে। সুনৃতকে বারবার প্রশ্ন করেছে, তখন সে কি করবে ?

ওদের ডেকে এনে বসাবে এই এত যত্নের সোফায়, গালে হাত দিয়ে বসে গল্প জুড়বে কে কত মাইনে পায়, কার বাড়িতে কি কেলেঙ্কারী ? সুনৃত অস্বস্তির হাসি হেসে কেবল জবাব দিয়েছে, "বুদ্ধি খরচ করে কাজ কোরো। যাদের সঙ্গে আছি তাদের চটানোও যেমন ঠিক নয় তেমনি মাখামাখি করারও প্রশ্ন ওঠে না। মাঝামাঝি রাস্তা বেছে নিয়ো।"

"বলা সহজ", অনুশীলা গন্‌গন্‌ করেছে, "করা সহজ নয়।"

"তাই তো বলছি, বুদ্ধি খরচ কোরো।"

"তুমি তো তাই বলে খালাস। বাস্তব সমস্যাগুলি ভেবে দেখেছ ? কেউ হয়তো খালি পায়েই এসে ঢুকল আর আমার এমন সুন্দর সতরঞ্চি দুটোর বারোটা বাজল। কারুর বাচ্চা এসে বসল সোফা সেটে, দিল পেচ্ছাপ করে।" কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এসেছে অনুশীলার।

সুনৃত কথা বাড়ায়নি। কিন্তু তার নীরবতা অনুশীলার সমস্যাকে হালকা করেনি। সাতদিন ঘর সাজাতে সাজাতে অনুশীলা কেবল ভেবেছে, কি করে এ-বিপদ কাটানো সম্ভব। প্রতিবেশী কারা, খোঁজ পর্যন্ত করেনি। কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে দুপাশে দুই অবাঙালি পরিবার। প্রথম দিন বাড়ি দেখতে এসেও তাই মনে হয়েছিল। সুনৃতের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় ইচ্ছে করে সে কোনও দিকে তাকায়নি। মিলিকে মাঠে খেলতে যেতে দেয়নি, পাছে কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এত সতর্ক থেকেও প্রতিক্ষণ অনুশীলার মনে হয়েছে এ-প্রতিরোধ চলবে না। একদিন, যে-কোনও দিন, এক-সময়, হয়তো এখুনি, ওরা এসে দরজায় দাঁড়াবে, প্রতি-বেশীর দাবি নিয়ে ভেতরে ঢুকবে, নির্লজ্জ নকল আত্মীয়তার সুর এনে নানা রকম ব্যক্তিগত পারিবারিক প্রশ্ন করবে, আর এই সযত্ন সতর্ক অবরোধ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হবে।

সেই আতংকিত মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে অনুশীলা প্রথম কি

করবে ভেবে পেল না। আসলে তার মন ভাববার শক্তি হারিয়ে ফেলল। যন্ত্রচালিতের মত সে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলে অনুশীলা দেখতে পেল প্রৌঢ়া এক মহিলাকে। কর্কশ লাবণ্যহীন শক্ত সুদীর্ঘ দেহ, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি পুরুষ। রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রং: কটা চোখের মাঝখানে টানা লম্বা নাক ঈগল পাখির ঠোঁটের মত সামনে বাঁকানো। তার নিচে গোঁফের স্পষ্ট রেখা। অবিন্যস্ত জট-পাকানো চুলের অর্ধেক সাদা। হাড়ল মুখে কেমন একটা কঠোর ব্যঞ্জনা। মহিলার পরিধানে ঝুল-ঝুল পেটিকোট। দেহের ঊর্ধ্ব ভাগে শুধু পাতলা ব্লাউজ। ঝুলেপড়া স্তনের অগ্রভাগ কটিদেশে সামান্য প্রকাশিত।

অনুশীলা হতভম্ব হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

মহিলা কঠিন মুখে হঠাৎ আশ্চর্য মোলায়েম হাসি হাসলেন। আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকলেন।

"নমস্তে বহিন্‌জি। এই আপনার পাশেই থাকি। আপনারা সাত রোজ হল এসেছেন, এখনও আলাপ হয়নি, তাই আলাপ করতে এলাম।"

অনুশীলা শুকনো হাসি হেসে বলল, "বসুন।"

মহিলা সোফায় বসলেন। "আপনারা বাঙালি।"

হ্যাঁ!"

"বাঙালিরা খুব সৌন্দর্যপ্রিয় হয়ে থাকে।" মহিলা ঘরখানাকে তারিফের চোখে দেখলেন।

অনুশীলা মনে মনে একবার মা-কালীর নাম করল।

"আমরা সিন্ধ্রী।"

অনুশীলা মনে মনে বলল, সর্বনাশ!

"আমার স্বামীর নাম মিঃ ঘনশ্যাম মিরচান্দানী।" মহিলা গম্ভীর স্বরে বললেন। "তিনি একেবারে সময় পান না, অপিসে কাজ তো আছেই, তার ওপর বড় ছেলে দোকান দিয়েছে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে বসতে হয়। তাই তিনি এসে খবর করতে পারেননি।"

মনে মনে অনুশীলা বলল, বাঁচিয়েছেন। প্রকাশ্যে, "তাতে কি আর হয়েছে। কাজকর্মে সবাই ব্যস্ত থাকেন, খোঁজখবর করবার

সময় কোথায় ?''

"না, না, সে কি কথা ?'' মহিলার ঠনঠনে স্বরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। "পাড়াপড়শি একে অন্যের খোঁজ করবে না তো করবে কে ?''

অনুশীলা কিছু বলার দরকার মনে করল না।

"আপনাদের পদবী কি মুখার্জি ?''

"হ্যাঁ। কি করে জানলেন ?''

"পিওনের কাছে। চিঠি নিয়ে এসেছিল না ? আমায় জিজ্ঞেস করল মিঃ মুখার্জি নামে কেউ নতুন এসেছেন না কি ? আপনার স্বামী কোথায় কাজ করেন ?''

অনুশীলা দপ্তরের নাম করলো।

"অ্যাসিস্ট্যান্ট বুঝি ?''

"না। এন্‌জিনীয়র।''

"ও। মিঃ মিরচান্দানী অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগামী বছর রিটায়ার করবেন।''

মিরচান্দানী-জায়া এমনভাবে স্বামীর পদগৌরব ঘোষণা করলেন যেন অ্যাসিস্ট্যান্ট এন্‌জিনীয়রের চেয়ে অনেক উঁচু।

অনুশীলার সহ্য হলো না।

"এ-বাসা আমাদের পাওয়ার কথা নয়। করোলবাগে বাড়িওয়ালা মামলার ভয় দেখিয়ে নোটিস দেওয়াতে আউট-অব-টার্ন এক-দুই-তিন ধাপ নীচে বাসা পাওয়া গেছে।'' ধাপগুলো অনুশীলা পরিষ্কার করে থেমে উচচারণ করল। "বেশিদিন আমরা এখানে থাকব না।''

সিন্ধী রমণী অনুশীলার কথার ঝাল গায়ে মাখলেন না।

"ভালো বাসা পেলে চলে যাবেন বৈকি। তবে এখানে সুবিধে অনেক। যাতায়াতের খরচ কমে যায়। জিনিসপত্রও বেশ ভালো দামে পাওয়া যায়। অবিশ্যি সবকিছুর দাম যা বেড়ে গেছে, দিন গুজরান মুশকিল। তা, আপনাদের অবস্থা ভালো, ছেলেপিলে বড় হয়নি, আপনাদের গায়ে লাগবার কথা নয়।''

এবার অনুশীলা কিছু প্রীত হল।

"খরচ সবারই আছে'', নিজেকে সামান্য উঁচুতে তুলে সে বলল। একবার ঘরের আসবাবপত্র, দরজা-জানালার পর্দা, মেঝের সতরঞ্চি

সবকিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে, যোগ করল, খরচ করলেই খরচ !''

"তা তো বটেই। এই দেখুন না, আমার সেজ-ছেলেটা এক বছর মাথা খারাপ হয়ে পড়ে আছে! তার চিকিৎসা পর্যন্ত ভালো করে করাতে পারছি না!''

অনুশীলার বুক দারুণ কেঁপে উঠল! পাগল? পাশের বাড়ি, এই সামান্য পাতলা দেওয়ালের ব্যবধানে, একটা পাগলের বাস?

হঠাৎ মনে পড়ল, যেদিন বাসা দেখতে এসেছিল সামান্য-ফাঁক পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে একজোড়া চক্ষু তাকে অনুসরণ করছিল। মনে পড়তে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। গলা এলো শুকিয়ে।

"পাগল?'' অতি কষ্টে বলল অনুশীলা।

"না, না, ভয় পাবার কিছু নেই। অনেকটা সেরে এসেছে। কোন উৎপাত করে না। শুধু চুপ করে বসে থাকে। দিন রাত্রে দু'চারটের বেশি কথা বলে না। দেখলে আপনি বুঝবেন না তার মাথা খারাপ।''

"কেন, পাগল কেন?'' বোকার মত প্রশ্ন করল অনুশীলা।

"নসীব, বহিন্‌জি, নসীব।'' গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ক্ষেদে আরও কঠিন শোনালো। "এম. এ. পড়ত ছেলে আমার, কোথায় বুড়ো বাপের পাশে দাঁড়াবে, না মিথ্যে হয়ে রইল। কেন পাগল হল তা কি আমরাই জানি? পার্টিশনের পর আমরা যখন করাচী থেকে চলে আসি, তখনই ওর মাথা একটু খারাপ হয়ে যায়। গুজরানওয়ালায় আমাদের গাড়ি থামিয়ে মুসলমানরা বহু লোককে হত্যা করেছিল। আমার শ্বশুরকেও কেটে দু'টুকরো করে দিয়েছিল। নেহাত ভগবানের কৃপায় আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। সেই থেকে ওর শক্ লাগে। তখন ওর বয়স কতো—দশ বছর। আমরা অনেকদিন বুঝতে পারিনি।''

"মারধর করে না তো?'' ভয়ে ভয়ে বলল অনুশীলা।

"একেবারে না। ঐ যে বললাম, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন না ওর মাথার দোষ। শুধু চুপ করে থাকে। কি যে সব ভাবে ভগবান জানেন। কলেজেও যায় না, চাকরিও করবে না। তবে এখন অনেকটা ভালো।'' একটু থেমে কণ্ঠস্বরকে কষায় করে,

"দিন চারেক আগে হঠাৎ আমাকে এসে বলে বসল, আমি বিয়ে করব।"

"কেন?" প্রশ্ন করেই অনুশীলা বুঝল কি-রকম বোকা শোনাল।

"খেয়াল! কে ওকে বিয়ে করবে বলুন?"

"কেউ করবে না।"

"আমিও তাই বললাম। শুনে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এই তিনদিন একটা কথাও বলেনি।"

পাগলের কথা শুনতে শুনতে অনুশীলার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। মিলি আজ বড্ড বেশি ঘুমোচ্ছে। জাগিয়ে দেবে নাকি?

মিরচান্দানী-জায়া অন্য কথা পাড়লেন।

"আপনার বুঝি একটি মাত্র মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"ক'বছর বিয়ে হয়েছে?"

"পাঁচ বছর।"

"মেয়ের বয়স কত?"

"চার।"

"আর হবে না?"

অনুশীলা মনে মনে বলল, মরণ।

তাকে চুপ দেখে মহিলা বললেন, "আপনার বয়স কতো?"

মেয়েরা যেমন বলে, অনুশীলাও তাই বলল, "আপনার কি মনে হয়?"

মহিলা বিনা হাস্যে জবাব দিলেন, "আজকালকার মেয়েদের কি বয়স বোঝা যায়? কুড়িও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে।"

অনুশীলা একটু হাসল।

"ওর মাঝামাঝি একটা হবে।"

"আমার মেয়েকে দেখেছেন?"

"না তো।"

"দেখেননি? আপনারই বয়সী হবে। নাম অমৃত। সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করে। আলাপ করবেন। বি. এ. পাশ।"

অনুশীলা নিরুৎসাহ রইল।

মহিলা বললেন, "আপনার সঙ্গে অমৃত আলাপ করতে চায়।"

"বেশ তো।" শুকনো কণ্ঠে অনুশীলা জবাব দিল।

এতক্ষণ অনুশীলার নজরে পড়েনি সিন্ধ্রী মহিলার হাতে এক খানা কাচের পাত্র। এমনভাবে তিনি পাত্রটিকে পেছনে রেখে বসেছিলেন, অনুশীলা দেখতে পায়নি। পেল, যখন তিনি পাত্রটা সামনে আনলেন।

অনুশীলা দেখল, চীনে মাটির বাটি, কাচের প্লেটে ঢাকা।

সামনের ছোট টেবিলে স্থাপন করে মহিলা বললেন, "নিজের হাতে বানিয়েছি। খেয়ে দেখবেন।"

ঢাকনা সরিয়ে অনুশীলাকে দেখালেন। দেখতে কেমন বড় বড় ডালের বড়ার মত মনে হল।

অনুশীলা বলে উঠল, "এ আবার কেন এনেছেন? কে খাবে এসব?"

"কেন? আপনারা খাবেন! আমাদের খুব প্রিয় খাদ্য এটা। ভালই লাগবে, দেখবেন।"

ভদ্রতা করা বাধ্যতামূলক মনে হল অনুশীলার।

"কেন আপনি কষ্ট করতে গেলেন?"

"কষ্ট কোথায়?" যেন ধমকে উঠলেন মিরচান্দানী-জায়া। "প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, খালি হাতে কি আসতে আছে?" উঠলেন। "এবার চলি। আসবেন আমাদের ওখানে।"

দরজা বন্ধ করতে করতে মামুলি জবাব দিল অনুশীলা, "আসব।"

সুনৃত আপিস থেকে ফিরলে সিন্ধ্রী রমণীর তৈরী খাবার অনুশীলা চায়ের সঙ্গে স্বামীর সামনে স্থাপন করল। নতুন খাদ্যে সুনৃতের স্বাভাবিক লোভ।

"এটা আবার কি বানালে?"

"বানাই নি।" অনুশীলা ভয়ানক গম্ভীর।

"তবে?"

"প্রতিবেশীর ভেট।"

"প্রতিবেশী ?"

"প্রতিবেশিনী।"

"অবাক করলে। সে আবার কে ?"

"পাশের বাড়ির সিন্ধ্রী মহিলা এসেছিলেন।"

"বাঃ বাঃ।" সুনীত খুশি হল। "দেখ তো কি ভাল লোক এরা! কোন বাঙালিতো এখনও আলাপ করতে আসেনি!" খাদ্য মুখে দিয়ে আস্বাদে তৃপ্ত হল সুনীত। "বেশ বানিয়েছে। আটার তৈরি। হঠাৎ মনে হয় বুঝি বড়া। ডাল, আটা, হিং আর বেশ ভাল ঘি। খেয়ে দেখ। বেশ লাগছে।"

অনুশীলা কেঁদে উঠল!

সুনীত অবাক।

"কি হল ? হঠাৎ কাঁদছ কেন ?"

"পাগল!"

"পাগল ? কে ? কোথায় ?"

"পাশের বাড়ি।"

"সে কি ? সিন্ধ্রী মহিলা পাগল ?"

"না, সে নয়। তার ছেলে!"

"থাম।" রেগে উঠল সুনীত। "কান্না থামিয়ে বুঝিয়ে বল। মাথায় কিছু ঢুকছে না!"

চোখের জল মুছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনুশীলা বিষম বিপদের বিবরণ দিল।

সুনীত মনে মনে ভাবিত হল। মুখে বলল, "অ, ওতে ভয় পাবার কি আছে। চুপচাপ থাকে, একেবারে যে ভায়োলেন্ট নয় তা তো বুঝতেই পারছো, এই সাত দিনে কোনও টের তো আমরা পাইনি!"

"কিন্তু—"

"পাড়ায় কত রকম লোকের বাস। এ-সব নিয়ে ভয় পেলে চলে ?"

"বিয়ে করতে চায় যে!"

"তাতে তোমার কি ?" সুনীত হালকা হাওয়া আনবার চেষ্টা করল। "তোমার বিয়ে তো হয়ে গেছে।"

অনুশীলা চটে উঠলো।

"তোমার ঘটে একরত্তি বুদ্ধি নেই।"

নতুন বাসায় এসে হরদেঈ আনন্দে অস্থির।

জীবনে প্রথম সে নিজের অধিকারে পরিপূর্ণ গৃহ পেয়েছে। বাপ মোটর চালক। মোটরওয়ালা মনিবের অট্টালিকার আউট-হাউসে তার জন্ম। বাপের মনিব বদলেছে, হরদেঈ এক আউট-হাউস থেকে অন্য আউট-হাউসে স্থানান্তরিত হয়েছে। সারি সারি আউট-হাউসে চাকর-বাকর, ধোবী, ড্রাইভার, দরজি ইত্যাদি বিচিত্র মানুষের-বাস। জীবনের এমনি এক আউট-হাউস পরিচ্ছেদে ত্রিলোকচাঁদের চোখে হরদেঈ ঝিলিক তুলেছিল, মনে রং লাগিয়েছিল : পাশাপাশি দুই আউট-হাউসের দুটি জীবন একদিন মিলিত হয়ে গেল। দিল্লী এসেও সুদীর্ঘকাল কেটে গেল আউট-হাউসে। স্বামী চাপরাশী থেকে দপ্তরী হল, দপ্তরী থেকে ভদ্রলোকের সম্মানে উত্তীর্ণ। কিন্তু আউট হাউসের অতিসীমিত জীবনে এ-পরিবর্তনের পূর্ণ আনন্দ হরদেঈ ও ত্রিলোকচাঁদ পেতে পারল না। কেমন যেন নিজেদের অন্ত্যজ মনে হত, অন্যরাও মনে করত।

লেখাপড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস দিয়ে, শান্তি কমিটির মাধ্যমে কংগ্রেসে কাজকর্ম করে ত্রিলোকচাঁদ নিজের সমাজে প্রমোশন পেয়েছিল। সবাই এখন তাকে বলে পণ্ডিতজি। চেহারাও পণ্ডিত পণ্ডিত হয়েছে। মাঝারি উঁচু দেহ এখন মাংসাধিক্যে বেশ বেঁটে দেখায়। গোলাকৃতি ছোট ভুঁড়ি হয়েছে। মাথায় বড় বড় চুল কাঁধ পর্যন্ত নামা। চোখে নিকেলের মোটা ফ্রেমে চশমা। কপালে রোজ প্রাতে চন্দন তিলক কাটে ত্রিলোকচাঁদ। খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা তার সাধারণ পরিধেয় ; যাতে সহজে ময়লা না হয় সেজন্যে গেরুয়া রঙের কুর্তা ব্যবহার করে। শীতকালে তাঁতে বোনা গরম কাপড়ের গলাবন্ধ কোট, খাকি প্যান্ট। কথাবার্তায় সে নম্র, বিনীত ; অধুনা বিশুদ্ধ হিন্দী বলবার অভ্যাস করেছে, উদুর্ শব্দ সযত্নে পরিহার

করে। নিজের সমাজে, এতগুলো কারণে, স্বভাবতই তার উচ্চতা স্বীকৃত। আপিসেও সবাই তাকে স্নেহ করে। তার সোচ্চারিত গুরুগম্ভীর হিন্দী অফিসরদের পর্যন্ত চমকে দেয়।

ত্রিলোকচাঁদের উন্নত সামাজিক জীবনের সঙ্গে আউট-হাউস নিবাসের বিসদৃশ দ্বন্দ্ব হরদেঈকে পীড়া দিত বেশি। স্বামী ভোলে-ভালা আদমি, অপমান গায়ে মাখত না ; কিন্তু হরদেঈর দেহে জ্বালা লাগত। যে পদস্থ রাজপুরুষের অনুগ্রহে তারা আউট-হাউসে স্থান পেয়েছিল, তিনি ও তাঁর পরিবার তাদের অনেকটা চাপরাশীর মতই দেখতেন। ত্রিলোকচাঁদের শিক্ষা ও সামাজিক প্রমোশন তাঁরা স্বীকার করতে চাইতেন না। কেরানি হবার পর ত্রিলোকচাঁদ আর সাহেবের গাড়ি সাফ করত না বটে, কিন্তু তিনি তাকে 'তুম' বলতেন, ফুট-ফরমাস, বাইরের কাজকর্ম সবই আগের মত করিয়ে নিতেন। মেমসাহেবের কাছে হরদেঈ আগের মত চাপরাশী বৌ-ই থেকে গিয়েছিল। এ নিয়ে হরদেঈর নালিশ জমা হয়ে উঠত : মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হত।

নতুন বাড়িতে উঠে এসে, অতএব, হরদেঈ মুক্তি পেল। এবার ভদ্রসমাজে তার স্বীকৃতির কোনও অন্তরায় রইল না। চতুর্দিকে সব ভদ্রলোকের বাস। তাদের কোয়ার্টারের এক পাশে একটি বাঙালি পরিবার, অন্য পাশে মাদ্রাজী। দুই বাবুই দস্তুরমত ভদ্রলোক। হরদেঈ কালবিলম্ব না করে দুগৃহের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ছেলেমেয়েদের সে এখন ফর্সা জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরের বাইরে পাঠায়, সাবধান করে দেয় যেন ছোটলোকের মত ব্যবহার না করে। বড় ছেলে দশ বছরের মোহন, পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মাঠে খেলা করে ; পরিতৃপ্ত নয়নে বারান্দা থেকে হরদেঈ সে দৃশ্য বহুক্ষণ প্রাণভরে নিরীক্ষণ করে। সকালে ত্রিলোকচাঁদ সাইকেল চেপে পাড়ার অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে একই সময়ে দপ্তরে যায়, বিকেল বেলা একই সময় আসে ; দলবদ্ধ সাইকেল-আরোহীর মধ্যে, দশজন ভদ্রলোকের মধ্যে, নিজের স্বামীকে দেখে হরদেঈর বুক টনটন করে ওঠে। নিজেও সে সাজসজ্জায় মনোযোগ দিতে শুরু করেছে। বাড়ির মধ্যে অবশ্য পেটিকোট আর ব্লাউজ হলেই চলে যায়, কিন্তু

বাইরে আসবার সময় হয় পরিষ্কার সালোয়ার কামিজ পরে, নয় তো পেটিকোটের ওপর শাড়ি। কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাই দিয়ে নিজের ও ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক সে সেলাই করে নিয়েছে। বিকেল বেলা সাটিনের সালোয়ার কামিজ পরে, টাসেল সংযোগে বড় খোপা বেঁধে, ঠোঁটে রং মেখে হরদেঈ যখন ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে বাজারে যায়, অথবা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বিড়লা মন্দির, তখন পরম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সে অনুভব করে, তার সঙ্গে পাড়ার অন্য সব স্ত্রীলোকদের বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই।

বিয়ের পর হরদেঈ বেশ সুন্দরী হয়েছিল। জীর্ণ দেহে মাংস লেগে সজীব, কমনীয় দেখাতো। ফর্সা রং আরও তাজা হয়েছিল। এমন কি চোখের কটা বর্ণটাও অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও পর পর চারবার মা হবার মাশুল দিয়ে দেহে তার ভাঙন ধরেছে। মোটা হয়নি, কিন্তু রোগাও সে নয়। বাঁধন ভেঙে গেছে শরীরের : স্তন ঝুলেছে, পেটে মাংস জমেছে, কপালে গালে দু'চারটে ভাঁজ পড়েছে : তাতে হরদেঈর আপসোস নেই : এ-পাড়ায় তার বয়সী স্ত্রীলোকদের প্রায় সবারই দেহের এক অবস্থা।

কিন্তু একদিন, কি জানি কোন মন-জোলুশি খেয়ালে, দোকান থেকে হরদেঈ, যা আগে কখনও করেনি, হালফ্যাশানের কাঁচুলি কিনে আনল, সেজেগুজে বিকেল বেলা স্বামীর সামনে যখন দাঁড়াল ত্রিলোকচাঁদের মাথা কেমন ঘুরে গেল, বর্তমান ও অতীতের অনেকগুলি বছর ত্বরিৎ গতিতে পার হয়ে, ফিরোজপুরে এক বাংলো বাড়ির আউট-হাউসে একটি জীর্ণদেহা স্বপ্নমাখা যুবতী অস্পষ্ট স্মৃতি-পথে উপনীত হল।

হরদেঈ মুচকি হেসে বলল, "হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?"

"দেখছি।"

"কি দেখছ?"

"খুবসুরতী।"

"চোখে লাগছে?"

"বড় বেশি লাগছে।"

"লাগুক। পুরুষ মানুষদের এমন লাগা দরকার মাঝে মাঝে। যা বুড়ো হয়ে গেছ!"

"তুমি তো জোয়ান আছ! তাতেই চলবে।"

"জোয়ান তো আছিই।"

ত্রিলোকচাঁদ অন্য কথা ভাবতে ভাবতে দপ্তর থেকে বাড়ির পথে সাইকেলে ফিরছিল। আপার ডিভিশন কেরানির মাইনেতে সংসার চলতে চায় না। এতকাল আউট-হাউসে থেকেছে, ঘর ভাড়া দিতে হয়নি। এখন বাড়ি-ভাড়া বাবদ মাইনের এক-দশমাংশ কেটে নেয়। তারপর বিজলী আছে, জল আছে। চারটে সন্তান ও মিঞা-বিবির খোরাক, কাপড়-জামা, স্কুলের মাইনে, সবকিছু। প্রথম মাসেই বুঝতে পেরেছে এ মাইনেতে সংসার চালানো শক্ত হবে। রোজগার এক-আধটু বাড়ানো দরকার। কি করে সম্ভব তাই বাড়ি ফিরবার পথে ত্রিলোকচাঁদ ভাবছিল। পুরানো বাসায় হরদেঈ সেলাই করে দু'পয়সা কামাত। এখানে এসে তার গর্ব বেড়েছে। পাড়ার লোকদের জন্যে সে সেলাই করতে পারবে না। বড় ছেলেটা স্কুলে পড়ে, ক্লাসে ভালই করছে, তাকে দিয়ে রোজগারের পথ নেই। নিজেকেই, সুতরাং, বাড়তি কিছু একটা করতে হবে। অনেকদিন থেকে ভাবছে এক-আধটু ব্যবসা করবে। সুযোগ আছে। পঞ্জাবে শত শত ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে। কুটীর-শিল্পের মত। সাইকেল, সেলাইর কল থেকে মাঝারি ধরনের কারখানার কলকব্জা পর্যন্ত অনেক কিছু তৈরি হয়। তাদের এজেন্সি মেলা কঠিন নয়। অর্ডার আনতে পারলে ভাল কমিশন মেলে। পরিচিত কেউ কেউ এ-কাজ করছে। সবারই দু'পয়সা আসে। একজন তো এখন নিজেই ছোট কারখানা খুলে বসেছে। কারখানা খুলে বসা পঞ্জাবীর সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন। পরের নোকারীতে শাঁস নেই। যা আসে তার বেশি যায়। এতদিনের চাকরিতে অনেক কষ্টে সে কিছু পয়সা করেছে; এবার মাসিক ঘাটতি মেটাতে সে-সামান্য পুঁজিতে হাত পড়লে বড় দুঃখের হবে।

ত্রিলোকচাঁদ ভাবছিল কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে পঞ্জাব ঘুরে আসবে। আম্বালা, লুধিয়ানা, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, জলন্ধর। দেখে আসবে কোন জিনিসের এজেন্সি সবচেয়ে সুবিধের হতে পারে। এ-

বিষয়ে এক-আধটু প্রাথমিক কাজ সে করে রেখেছে। যারা এ-ধরনের কাজ করে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। দোকানে দোকানে ঘুরে খোঁজখবর নিয়েছে। যা জেনেছে, দেখেছে, তাতে নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। ভগবান দেহ দিয়েছেন মেহনতের জন্যে। দেহে ঘাম তোল, লক্ষ্মী প্রসন্না হবেন। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভাল করে বাঁচা। তার একমাত্র পথ, পরিশ্রম করা। শ্রম কর, পুরস্কার আসবে।

বন্ধুবান্ধব রিস্তেদার সবাই, ত্রিলোকচাঁদ দেখতে পায়, জীবনমান উন্নততর করবার সংগ্রামে একমনে লেগে রয়েছে। দিনের বেলা অফিস করে রাত্রে ট্যাক্সি চালাচ্ছে : দু'বছর পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের পয়সায় ট্যাক্সি কিনে দিব্যি স্বাধীন ব্যবসা দিয়ে বসেছে। তার সহকর্মী এক ছোকরা দুপুর বেলা টিফিনের নাম করে তিনচাকা স্কুটার নিয়ে ঘণ্টা খানেক দু'-পাঁচ টাকা কামিয়ে আনে দিনের পর দিন। কেউ বা সন্ধ্যাবেলা দোকান করে। অনেকেই মালপত্র বেচা-কেনা করে। সবাই যেন জীবনটাকে ছুটিয়ে চালাচ্ছে উন্নত মানের লক্ষ্যে। এই তীব্র প্রতিযোগিতার রণাঙ্গনে অলস কর্মবিমুখের স্থান নেই।

খোঁজখবর করে ত্রিলোকচাঁদের একটা মেশিন বেশ পছন্দ হয়েছে। ডুপ্লিকেটিং মেশিন। খুব সহজে হাতে চালিয়ে যত ইচ্ছে কপি তৈরী করা যায়। বিদেশী ডিপ্লোম্যাট মেশিনের চমৎকার নকল। কয়েকটি পঞ্জাবী যুবক এঞ্জিনীয়র একত্র হয়ে সরকারী সাহায্যে মেশিনটা তৈরী করছে। সঙ্গে যে চকচকে মোটা কাগজ অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও তৈরীর ব্যবস্থা শেষ হয়ে আসছে। শীঘ্র উৎপাদন শুরু হবে। ত্রিলোকচাঁদের ধারণা, এ-ধরনের ডুপ্লিকেটিং মেশিনের অফুরন্ত চাহিদা হবে দিল্লী শহরে। প্রত্যেক আপিসেই চেষ্টা করলে চালু করা যাবে।

এর এজেন্সি এখনও পর্যন্ত দিল্লীতে কেউ নেয়নি। ত্রিলোক-চাঁদ খবর পেয়েছে, পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে এজেন্সি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। পাঁচ হাজার টাকা তার নেই। যা জমিয়েছে সব একত্র করলে প্রায় চার হাজার হবে। বাকী এক হাজার সংগ্রহ

করা কঠিন নাও হতে পারে। চিঠি লিখে মেশিন সম্বন্ধে কাগজ-পত্র সে আনিয়েছে। অবশ্য মন তার ঠিক হয়নি। আরও দু-পাঁচটা সম্ভাব্য প্রস্তাবও বিবেচনা করেছে ; বাইরে ঘুরে না এলে মন স্থির হবে না। কিন্তু ডুপ্লিকেটিং যন্ত্রটার কথাই বার বার সে ভাবছে। এখন সর্বাগ্রে কোন এক এঞ্জিনীয়ারের পরামর্শ দরকার। মেশিনটা মজবুত হবে কি না ; কাজ দেবে কেমন ; যত সহজে চলবে বলে নির্মাতারা দাবী করেছে তা ঠিক কি না ; চাহিদা কেমন হবে, এসব বিষয়ে একজন এঞ্জিনীয়ারের মতামত তার চাই।

এঞ্জিনীয়ার একজন তার প্রতিবেশী, ত্রিলোকচাঁদ তা জানে। মুখার্জি সাহেব তাকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু সে তাঁকে চিনেছে। কেরানী পদে উন্নীত হবার আগে যে-দপ্তরে কিছুকাল তাকে দপ্তরীর কাজ করতে হয়েছিল তার শেষ দিকে মুখার্জি সাহেব কাজে যোগদান করেছিলেন। এখন তিনি সাত নম্বর কোয়ার্টারে আছেন। দপ্তরে যাওয়ার সময়, বা ফিরবার কালে, বা এমনি বাইরে যাবার পথে, ত্রিলোকচাঁদ তাঁকে দেখতে পেয়েছে। আলাপ করবার ইচ্ছা থাকলেও এগিয়ে যায় নি। তিনি হয়তো চিনতে পারেন নি। না পারা দোষের নয়। অল্পকাল ত্রিলোকচাঁদ মুখার্জি সাহেবকে এক দপ্তরে দেখেছে : সে ছিল দপ্তরী, তাকে মনে রাখবার কোন কারণ নেই। পুরাতন পরিচয় ঝালিয়ে যদি সে গিয়ে দাঁড়ায় মনে নিশ্চয় পড়বে। নিশ্চয় খুশী হবেন মুখার্জি সাহেব তার উন্নতিতে। বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপকদের সর্বত্র সুনাম। পাঞ্জাবী কোনও এঞ্জিনীয়ার কি সুপরামর্শ দেবে ? মেশিনটা ভাল মনে হলে হয়তো নিজেই এজেন্সি নিয়ে বসবে ; তার মুখের গ্রাসটি যাবে। তাই ত্রিলোকচাঁদ বাড়ি ফেরবার পথে ভাবছিল, আজ সন্ধ্যায় মুখার্জি সাহেবের কাছে একবার হাজির হবে। আসবার সময় সাত নম্বর কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে দু'বার তাকিয়েও দেখেছে। না, মুখার্জি সাহেব তখনও ফেরেন নি।

সন্ধ্যাবেলা অনুশীলা-মিলিকে নিয়ে সুনৃত প্রায় রোজই ঘুরে আসে। এ-পাড়ায় এসে বেড়ানো সহজ হয়েছে। স্বল্প ভ্রমণে

বিড়লা-মন্দিরে যাওয়া যায়, অথবা কালীবাড়ি। বিড়লা-মন্দিরের বাগানে গেলে মিলির আনন্দ ধরে না। সে ছোট ছোট শ্বেত পাথরের হাতিগুলির পিঠে চড়ে গান ধরে ; পাথরের বাঘ-সিংহের মুখে হাত ঢুকিয়ে নকল ভয়ে চীৎকার করে ওঠে ; ভালুকের কাঁধে বসে থাকে। নকল পাহাড়ের ওপর উঠতে মিলির কি আনন্দ! তেমনি আনন্দ স্লিপ খেতে। শুধু বিরাট-হাঁ-করা রাক্ষসটাকে মিলি সত্যিকারের ভয় পায়। মিলির যদিও রোজই বিড়লা-মন্দিরে যাবার ইচ্ছে, সুনৃত-অনুশীলা অবশ্য প্রতিদিন ওখানে যায় না। কালীবাড়ির পরিবেশ সুনৃতের ভালো লাগে। কালীবাড়ি ঘিরে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংস্কৃতি। দিল্লীতেও তার ব্যতিক্রম নেই। বাঙ্গালী-সমাজের সব বড় বড় উৎসব অনুষ্ঠান কালীবাড়িতে। তার চেয়েও সুনৃতের আকর্ষণ মা-কালীর মন্দির। মা-কালীর উজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তরে জীবন্ত-প্রায় মূর্তি। কোনদিন বা তারা আর একটু হেঁটে শঙ্কর রোড ধরে রীজের দিকে এগিয়ে যায়। দু'পাশে সংরক্ষিত পাথুরে জঙ্গল, আগে প্রায়ই খরগোস দেখা যেত রাস্তার ধারে, এখন কেবল শেয়াল চোখে পড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে। কখন-কখন তারা লাভার্স লেন দিয়ে এগিয়ে চলে। আঁকা-বাঁকা জঙ্গল-চেরা এই সুন্দর পথ সুনৃতের বড় প্রিয়, কিছু বেশি নির্জন বলে সন্ধ্যাবেলা অনুশীলা ওপথে যেতে আপত্তি করে। এ-নিয়ে দু'জনের এক-আধটু রসালাপ হয়।

"লাভার্স লেনে যেতে তুমি ভয় পাও, বিয়ে হয়ে গেছে বলে?" সুনৃত শুরু করে।

"বিয়ের আগে লাভার্স লেন পেলাম কোথায়?" অনুশীলা মুচকি হাসে।

"কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই। কংগ্রেসী রাজ নাগরিকদের চরিত্রশুদ্ধির গুরু দায়িত্ব নিয়ে রাস্তার নাম পালটে 'মন্দির লেন' রেখেছেন।"

"কি বে-রসিক!"

"তোমার কথা ভেবে, নিশ্চয়ই।"

"তার মানে?"

"বিয়ের পর মেয়েদের মন্দির-মতি হওয়া দরকার।"

"আর পুরুষদের মন্দির-গতি।"

"একটা মজা দেখেছ?" সুনৃত একটু গলা চড়ায়। "লাভার্স লেনে কদাপি কোন রোমান্স কারুর চোখে পড়েনি।"

"তোমাকে বলেছে!"

"সত্যি বলছি। দিল্লীর মত আন-রোমান্টিক শহর আমি কোথাও দেখিনি। এতো যে আমরা বেড়াই, তুমি কখনও দেখেছ ছেলেমেয়েদের হাত-ধরাধরি করে ইন্ডিয়া গেট বা লোদি গার্ডেন্স্-এ ঘুরে বেড়াতে?"

"তা দেখিনি।"

"আমাদের কলকাতায় লেকে, ইডেন গার্ডেনে, বোটানিক্সে, ময়দানে, এমন কি কার্জন পার্কেও যে-রোমান্স দেখা যায়, এ-শহরের কোথাও তা দেখতে পাবে না।"

"বড় দুঃখ তোমাদের, না?"

"আসলে কি জানো? রোমান্সের মত জলীয় পদার্থে পাঞ্জাবী-দের একেবারে লোভ নেই। ওরা দিশী রেস্তোরাঁয় গেঁয়ো ব্যান্ডের সঙ্গে বেতাল বিলিতি নাচ করবে বান্ধবীর নগ্ন কটিতটে বাহু বেষ্টন করে। নয়তো মদ্যপান করবে। বলিষ্ঠ জাত, আসল কর্মে ঝোঁক বেশি ওদের।"

"দরকার নেই এমন বলিষ্ঠ জাত নিয়ে।" অনুশীলা নাক সিটকাল। "তার চেয়ে আমাদের বাষ্পীয় বাঙ্গালীরা অনেক ভাল।"

সেদিন সুনৃত-অনুশীলা-মিলি কনট প্লেসে বেড়াতে গিয়েছিল। অনুশীলার কিছু টুকিটাকি কেনবার ছিল ক্যুইন্স্ওয়ের রিফিউজি দোকানে। কেনা শেষ হলে সুনৃত বলল, "চলো একটু চা পান করা যাক।"

অনুশীলা আপত্তি জানাল। "চা নয়। তার চেয়ে চলো কফি হাউসে।"

সাউথ ইন্ডিয়া কফি হাউস। টাটকা তামিল কফি পাওয়া যায়। মাদ্রাজীদের গায়ের বর্ণের মতো চকচকে তামাটে গরম কফি। অথবা

ক্রীম-মেলানো বরফ-শীতল।

পান শেষ হলে অনুশীলা খানিকটা কফি-পাউডার কিনতে গেল। কফি হাউসের মালিক বিশ্বনাথের সঙ্গে পুরানো খদ্দের হিসেবে সুনৃতের বেশ আলাপ। সে গিয়ে দাঁড়াল বিশ্বনাথের ছোট অফিস ঘরের দরজায়।

পান-চিবানো কালো দাঁতে একগাল হেসে বিশ্বনাথন সুনৃতকে অভ্যর্থনা করল।

"নমস্কারম, মিঃ মুখার্জি।"

"নমস্কারম। তারপর, টাটকা খবর কি?"

"কই আর খবর?"

"সে কি মিঃ বিশ্বনাথন? দিল্লীতে কবে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যার পূর্বাভাস কফি হাউসের মালিক পান নি?"

বিশ্বনাথন চতুর ও চালাক মানুষ। কথা বলে আর হাসে। কালো, মোটা, কুরূপ হলেও সদা হাস্যময় তার সঙ্গ সবাকার বাঞ্ছিত। অনেক খবর সে রাখে, রাজা-উজির থেকে গরীব কেরানীর। রাজধানীর দক্ষিণ ভারতীয়, বিশেষত তামিল সমাজে, বিশ্বনাথনের স্থান স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। একা নিজের চেষ্টায় বহু তামিলকে সে দিল্লী এনে রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে; তাদের ধারে খাইয়েছে, ঋণ দিয়েছে, চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে এমন কি বাড়ি পর্যন্ত!

স্বল্প শিক্ষিত এই মানুষটা কুড়ি বছর আগে যুদ্ধের পূর্বে রাজধানীতে এসেছিল। দু'চার বছর চাকরি করার পর যুদ্ধ লাগার পরেই কফি হাউস খুলে বসে। বসবার সঙ্গে সঙ্গে কপাল খুলে যায়। কয়েক বছরে বিশ্বনাথন অর্থবান হয়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ কফি ও মাদ্রাজী আহার্য পরিবেশনে কফি হাউসের যে-সুনাম গড়ে ওঠে বিশ্বনাথন আজ পর্যন্ত সযত্নে তা রক্ষা করে এসেছে। রাজধানীর পদস্থ, মানী মানুষেরা প্রায় সবাই বিশ্বনাথনের খদ্দের, তাঁদের অনেকে, বিপদে-আপদে, তার কাছে ঋণী। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বিশ্বনাথন মাদ্রাজ থেকে নবাগত কর্মপ্রার্থী যুবকদের চাকরি পাইয়ে দেয়, তাই মাদ্রাজী সমাজে সে তামিল-বন্ধু নামে

পরিচিত।

সুনৃতকে বিশ্বনাথন বলে উঠল, মিঃ মুখার্জি, একটা কাজ করে দেবেন?"

"বলুন। আমি কি কাজে লাগতে পারি আপনার?"

"একটা চাকরি চাই।"

"সে কি? আমার কাছে চাকরি? কার জন্যে?"

"এক ছোকরা এসেছে আজ তিন মাস হল। খাচ্ছে দাচ্ছে বেশ আছে। খুব যে একটা চাকরির গরজ আছে তাও মনে হচ্ছে না। অথচ ছেলেটা ভাল। মাদ্রাজ কর্পোরেশন টেকনিক্যাল স্কুলের ডিপ্লোমা আছে।"

"আপনার পক্ষে চাকরি জোগাড় করা তো জলভাত। দিন না বড় কারুর কাছে পাঠিয়ে?"

"চেষ্টার কি কিছু বাকী রেখেছি? কিন্তু ছোকরার এমন বরাত কিছুই জুটছে না।"

"জুটে যাবে। আপনি না জোটাতে পারলে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীও পারবেন না।"

"কিন্তু ছেলেটার নিজেরই যে গরজ নেই। বিনা পয়সায় খাওয়া পাচ্ছে, থাকবার জায়গা পাচ্ছে, আর কি চাই।"

"দিন ভাগিয়ে।"

"সর্বনাশ! তা কি পারি? আমার একটা মান-সম্মান নেই! কত লোককে এনেছি, পুষেছি, চাকরি করে দিয়েছি, এখন কি কাউকে তাড়াতে পারি?"

"আপনার বুকের পাটা আছে। এই যে এত লোকের উপকার করে বেড়ান, ওরা আপনার নিন্দা করে না?"

"তা করে কি না করে আমার ভাববার সময় নেই।"

"ঠকায় না?

"খুব বেশি ঠকিনি। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা খুব সোজা। যতদিন চাকরি না পাবে, খাবে থাকবে বাকীতে। চাকরি পাবার পরে মাসিক কিস্তিতে টাকা শোধ করবে।"

"যদি না করে?"

"না করে উপায় নেই। দিল্লীতে কোন মেসে জায়গা হবে না। দপ্তরে চাকরি টলবে।"

"সবাই তাহলে, টাকা শোধ করে দেয় ?"

"প্রায় সবাই। দু'চার জন দিতে পারে না। তাদের অক্ষমতা দেখে আমি মাপ করে দিই।"

"এ-জন্যেই আপনাকে সবাই তামিল-বন্ধু বলে।"

বিশ্বনাথন হাসল। "উপায় কি বলুন! তামিলনাদে ব্রাহ্মণের স্থান নেই। এখন অব্রাহ্মণের পুরো রাজত্ব। চাকরি, এমন কি স্কুল-কলেজে ভর্তি পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে প্রায় বন্ধ। আমরা ব্যবসা বুঝি না, চাকরি বুঝি। সুতরাং কিছু একটা করতে তো হবে।"

"তবু তো আপনারা নিজেদের সমাজের কথা ভাবেন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেন। আমাদের বাঙ্গালীদের তাও নেই। নিজ প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরের হাতে ; চাকরির বাজারে আপনাদের রাজত্ব ; আর বিদেশে, ধরুন এই দিল্লী শহরেই, বাঙ্গালীর জন্য কোন বাঙ্গালী কিছু করবে না।"

"বিশ্বাস হয় না, মুখার্জি সাহেব। সবাই জানে আপনারা কি ভীষণ স্বজাতি-সচেতন।"

"সেটা আমাদের আরও ক্ষতি করেছে", সুনীত বলল। "বাঙ্গালীয়ানা বজায় রাখতে গিয়ে আমরা কারুর সঙ্গে মিশি না, শ্রদ্ধার সঙ্গে কারুর দিকে তাকাই না। ভাবি, যা আমাদের আছে, তা কারুর নেই। অথচ এই দিল্লীতে এতগুলি পদস্থ বাঙ্গালী আছেন, খুঁজে বার করুন কার সাহস আছে একটা বাঙ্গালীর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন!"

"চাকরি তো আপনারা কম পাচ্ছেন না!"

"যা পাচ্ছি, তা কেবল যোগ্যতার জোরে। আর যোগ্যতার দৌড় কতখানি তাতো আপনি জানেন।"

"যাই বলেন, মিঃ মুখার্জি, আপনারা একদিন নিজেদের জন্য অনেক কিছু করে নিয়েছেন। আজও ভারত সরকারের কতগুলি দপ্তর বাঙ্গালী প্রধান। আগের দিনের উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীরা যে-

পরিমাণে স্বজাতি-পোষণ করেছেন তার তুলনায় আমরা এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি।"

"খুব পেরেছেন" সুনীত জোর দিয়ে বলল। "একবার হিসাব করে দেখুন।"

"না, না, এখনও খুব পারিনি। নানা বাধা আসছে। এখন দেশের সর্বত্র, সব প্রদেশে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাথা জাগিয়ে উঠেছে। দেখুন না এই দিল্লী শহরেই কি হয়েছে। কুড়ি বছর আগে আমি যখন এখানে আসি, ভারত সরকারের কর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগ বোধকরি ছিল বাঙ্গালী। তারপর মাদ্রাজী—তখন মাদ্রাজ বলতে বর্তমানের সব দক্ষিণ ভারত বোঝাত। গুজরাটি, মারাঠি, হাতে গোনা যেত। উড়িষ্যা, আসাম, রাজস্থান থেকে লোক নোকরির জন্যে দিল্লীতে প্রায় আসতই না। পাঞ্জাবীরা যেত কেবল সৈন্য-বিভাগে। আর এখনকার অবস্থা দেখুন। এক মারাঠিই এখন দিল্লীতে হাজার কুড়ি হবে। ওড়িয়া, অসমীয়া, বিহারী, রাজস্থানী, গুজরাটি, কাশ্মীরি, সবাই রাজধানীতে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পাঞ্জাবীদের কথা তো বলারই নয়। গোটা রাজধানী শহরটা তারা দখল করে বসেছে। ভারত সরকারের বিশ লক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে অর্ধেক এখন পাঞ্জাবী। যে যেখানে একটু উঁচু পদে আছে, সেই চেষ্টা করছে নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দেশভাইদের জন্যে স্থান করে দিতে। এই যে হাজার হাজার পাহাড়ী মানুষ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ থেকে দিল্লীতে চাকর ও চাপরাশী হবার জন্য নেমে আসছে, কুড়ি বছর আগে এদের কদাচিৎ দেখা যেত। তাহলেই ভাবুন, সবাই নিজেদের স্থান গুছিয়ে নেবার কাজে ব্যস্ত। মাদ্রাজী যে মাদ্রাজীকে সাহায্য করবে, সে-রাস্তাও এখন কণ্টকাকীর্ণ।"

সুনীত বললে, "আমরা সবাই যদি আঞ্চলিক স্বার্থ গুছিয়ে নেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগি তাহলে ভারতবর্ষের কি উপায় হবে?"

একগাল হেসে বিশ্বনাথন বলল, "ভারতবর্ষ এখন অপেক্ষা করবে। তার সময় এখনও আসেনি। আপনাদের টাগোর বলেছেন, 'পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ'—এখন হচ্ছে এদের যুগ। ভারতবর্ষ এখন মাত্র একটা ভাবনা, ইমোশনাল প্রোপার্টি,

বুঝলেন না ? আমরা হয় তামিল, নয় বাঙ্গালী, নয় মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী। নয়তো হিন্দী। আসছে কাল আমরা আরও হব ওড়িয়া, অসমীয়া, সাঁওতাল, হিমাচলী, ডোগ্রী, কাশ্মীরি। আমাদের আঞ্চলিক ক্ষুধা কিছুটা না মিটলে আমরা জাতি হতে পারবো না। অন্তত আমি তো স্বল্প বুদ্ধিতে তাই বুঝি।"

ভয়ে ভয়ে সুনৃত বললে, "এই মধ্যপঞ্চাশেও আমরা আঞ্চলিক থেকে যাবো ?"

বিশ্বনাথন জবাব দিল, "কান পেতে শুনুন। কফি হাউসে কফি পান করতে গোটা ভারতবর্ষ সমবেত হয়েছে। তাকিয়ে দেখুন, দেশের প্রায় সব অঞ্চলের লোক আপনার সামনে বসে। বিচিত্র ভাষায় তারা কথা বলছে। দেখুন বাঙ্গালী বসেছে আলাদা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, সবাই আলাদা। কারুর সঙ্গে কারুর আদান-প্রদান নেই মনের, ভাবের। আমি মাঝে মাঝে এই ঘর থেকে বসে বসে এদের দেখি, আর একটা উদ্ভট কল্পনা আমার মাথায় আসে। সেটা শুনবেন ? আমি ভাবি হঠাৎ যদি আলো নিভে যায়, এ হল-ঘরটা প্রচণ্ড ঘূরপাক খেয়ে, লোকগুলিকে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে দেয় তা'হলে কেমন হয় ? খিচুড়ি পাকাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষাটাকে যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায় ? হঠাৎ যদি দেখতে পাই পাঞ্জাবী মেয়েগুলি মাদ্রাজী ছেলেদের সঙ্গে বসে আছে, তামিল স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী পুরুষদের সঙ্গে, আর সবাই ভুলে গেছে ইংরেজী, তা'হলে কেমন হয় ? স্বাধীন ভারতবর্ষের কি চেহারা দেখতে পান তা'হলে, মিঃ মুখার্জি ?"

বিশ্বনাথন হো হো করে হেসে উঠল।

সুনৃত দেখতে পেল কফি কিনে অনুশীলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে।

"আচ্ছা, চলি।"

"আসুন। চাকরি-টাকরি আছে কিছু খোঁজে ?"

"খোঁজ তো রাখিনে ! নিজের চাকরি হয়ে গেছে, আত্মীয়স্বজন এখন কেউ নেই যার চাকরির দরকার, বাঙ্গালী বেকারকে চাকরি পাইয়ে দেবার সাহস নেই, সুতরাং খোঁজ রাখবার দরকার হয় না।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সুনৃত।

দরজার কাছে পৌঁছতে অনুশীলা ধমকে উঠল, "এই মাতাল লোকটার সঙ্গে তুমি কি যে বক বক করো আমার মাথায় ঢোকে না।"

"মদ না খেলে চেতনা ও চিত্ত একটাও খোলে না।" সুনৃত ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল।

"আজ মনে হচ্ছে ও একটু বেশি টেনেছে," অনুশীলার কণ্ঠে গভীর বিরক্তি।

"তাই ওর চেতনা আজ খুলেছে খুব।"

ঘরকন্নায় অনুশীলা যে-সব সংস্কার চালু করেছে তার অন্যতম প্রধান হচ্ছে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই রাত্রির আহার সেরে নেওয়া। সুনৃত আপত্তি করেনি।

সন্ধ্যাবেলা আহার করে ভারতবর্ষের অর্ধেকের বেশি লোক, অনুশীলা সবাইকে বলে, নিজের পথে টানতে গিয়ে। তাতে লাভ কত ভেবে দেখ। সারা রাত খাদ্য হজম হতে পারে। খাবার পরেই বিছানায় শোবার আত্মঘাতী সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময় খাবার পরে বেড়ানও হয়ে যায়। চাকর-বাকর খুশি থাকে। গিন্নীদের সুবিধে হয়। সন্ধ্যার পরে খেয়ে নাও, তারপর ইচ্ছে হয় ঘুরে এসো, নয় গালগল্প কাজকর্ম করো, শোবার সময় এক-কাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ো। এক মাসের মধ্যে বাড়ির সবার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

আজ ফিরতে একটু দেরী হল। ফিরেই অনুশীলা আহারের ব্যবস্থা করল। আহারান্তে সুনৃত বসবার ঘরে একটা সবে-শুরু-করা 'পেরী ম্যোসন' নিয়ে বসল ; অনুশীলা সেলাই নিয়ে ঘরে ঢুকে রেডিও আস্তে খুলে দিল। মিলি বসল তার ছড়া ছবির বই নিয়ে।

দরজায় মৃদু করাঘাত হল!

সুনৃত দরজা খুলে দেখল একটি অপরিচিত মাঝবয়সী হিন্দুস্থানী পুরুষ।

হাত জোড় করে নত হয়ে সে নমস্তে করল।

মামুলি প্রতি নমস্কার করে সুনৃত চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল,

কি চাই ? তুমি কে ?

"বাবুজি। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না আমার নাম ত্রিলোকচাঁদ।"

"কোত্থেকে আসছ ?"

"আপনার দপ্তরে আমি এককালে দপ্তরীর কাজ করতাম। আপনি অবশ্য আমাকে খুব কমই দেখেছেন। আপনি যোগদান করবার মাস ছ'য়েকের মধ্যে আমি অন্য আপিসে চলে যাই।"

এবার একটু মনে পড়ল।

"হ্যাঁ, এবার চিনেছি। কিছু কাজ আছে ?"

"কাজ একটু ছিল, বাবুজি। কিন্তু আপনার তখ্‌লিফ্‌—"

"কি কাজ ?"

ইতিমধ্যে অনুশীলাও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সুনীত একেবারে লোক চেনে না। কে না কে সন্ধ্যাবেলা খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির সবকিছু দেখে নিচ্ছে। হয়তো সুনীত এখুনি তাকে এনে ভেতরে বসাবে।

অনুশীলাকে দেখে ত্রিলোকচাঁদ আরও সংকুচিত হল।

"আজ আপনি বিশ্রাম করছিলেন, বাবুজি। আমি না হয় আর একদিন আসবো।"

অনুশীলার মনে হল লোকটা তাকে দেখে পালাতে চাইছে।

"বলেই ফেল না, তোমার কি দরকার", সে হস্তক্ষেপ করল।

"রোজ রোজ বাবুজির টাইম থাকবে না।"

বিব্রত হয়ে ত্রিলোকচাঁদ নিবেদন করল, "একটা মেশিন সম্বন্ধে আপনার উপদেশ চাই, বাবুজি।"

"মেসিন ? কিসের মেশিন ? আমার উপদেশে তোমার কি হবে ?" সুনীত বিস্মিত হল।

অনুশীলা মাতৃভাষায় সুনীতকে সাবধান করল, "লোকটাকে বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, বুঝলে ? নিশ্চয় কোন কু-মতলবে এসেছে। চেপে ধরো তো !"

বুদ্ধিমান ত্রিলোকচাঁদ অবস্থা টের পেল।

গুরু-গম্ভীর হিন্দীতে ধীরে আস্তে সে তার সমস্যাটা সুনীতকে

বুঝিয়ে বলল। উপসংহারে যোগ দিল, "বাবুজি, আমি গরীব লোক। ব্যবসায় নামবার আগে মেশিনটা কেমন জেনে নিতে চাই! আপনি এঞ্জিনীয়র, তায় বাঙ্গালী, ভাবলাম, আপনার কাছে যেমনটি নিঃস্বার্থ, পারদর্শী দিগ্‌দর্শন পাবো, অন্য কোথাও তা পাবো না। এ-জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

অনুশীলার সন্দেহ গেল না। চাপরাশ-দপ্তরী মানুষ, মেশিনের ব্যবসা করবে। নিশ্চয় এটা বাজে চাল!

সুনৃত বলল, "মেশিনটা আছে তোমার কাছে?"

"না, বাবুজি। তবে কাগজপত্র আছে।"

অনুশীলা বলল, "দেখাও তো তোমার কাগজপত্র!"

ত্রিলোকচাঁদ উত্তর দিল, "আজ তো আনিনি। যদি বাবুজি কৃপা করেন, অন্য সময় নিয়ে আসব।"

অনুশীলা বাংলায় বলল, "দেখলে? সব মিথ্যে কথা!"

সুনৃত বলল, "কাগজপত্র না নিয়েই এসেছ?"

"হাঁ বাবুজি। যদি আপনার সময় থাকে আমি এখুনি নিয়ে আসছি। আমি আপনার কাছেই থাকি।"

"কাছেই থাক? কোথায়?"

"চৌদ্দ নম্বরে?"

অনুশীলা বলে উঠল, "এ-পাড়ায়? এ-পাড়ায় দপ্তরীরাও থাকে না কি?"

ত্রিলোকচাঁদ মৃদু হেসে জবাব দিল, "আমি এখন আর দপ্তরী নই মাতাজি। এক সময় ছিলাম। আমি এখন ইউ· ডি· সি·।"

"সে আবার কি?" অনুশীলা সুনৃতকে প্রশ্ন করল।

"আপার ডিভিসন ক্লার্ক, মাতাজি", জবাব দিল ত্রিলোকচাঁদ নিজেই।

একটু থেমে আরও বলল, "আপনারা যেদিন এ-পাড়ায় এলেন, আমরাও সেদিনই এসেছি।"

মনে পড়ল অনুশীলার। টঙ্গা ও সাইকেলে গোটা সংসার তুলে নিয়ে নতুন একটি পরিবারকে সে আসতে দেখেছিল। হঠাৎ তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

"এক পাড়ায় থাকি বলে তুমি ভেবেছ আমরা একই স্তরের মানুষ, না ? ওসব মেশিন টেশিন দেখবার সময় নেই আমাদের।"

সুনৃত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। লোকটাকে সে আগাগোড়া দপ্তরী ভেবে এসেছে। ভেতরে ডাকে নি, 'তুমি' বলে চলেছে। দপ্তরী থেকে লোকটা আপার ডিভিশন কেরানী হয়েছে, দস্তুরমত ভদ্রলোক। এখন আর অবশ্য ওকে 'আপনি' বলা বায় না।

ত্রিলোকচাঁদ অনুশীলার প্রতি জোড়হাতে নিবেদন করল, "মাতাজি, আপনারা যে আমার চেয়ে অনেক উঁচু, তা জানি বলেই তো আমি এসেছি।"

সুনৃত বলল, "কেউ উঁচু, কেউ নীচু নেই ভাই: আমাদের স্বাধীন দেশে সবাই সমান। তুমি আমার পুরানো দপ্তরের লোক, তাই আগের মতই তোমাকে দেখছি। চাকরিতে তো খুব উন্নতি করেছ। কি করে করলে ?"

"সন্ধ্যেবেলায় ক্যাম্প কলেজে পড়ে আই· এ. পাস করেছি, বাবুজি ভাবছি আগামী বছর বি· এ-টাও করে নেব।"

"বাঃ বাঃ, চমৎকার।"

"নিজে চেষ্টা না করলে গরীবদের জন্যে কে করবে, বলুন বাবুজি ?"

"নিশ্চয়। তা তুমি এসো একদিন, দেখে দেব তোমার কাগজ-পত্র। মেশিনটা দেখতে পেলে ভাল হত, কাগজে তো সব বোঝা যায় না, সবকথা সত্যিও হয় না।"

"তা জানি, বাবুজি! তবু যতটা সম্ভব। কাল আসবো সন্ধ্যে-বেলা ?"

"এসো। আটটার পরে এসো।"

ত্রিলোচাঁদ বিদায় নিলে অনুশীলা কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, "অন্য কোথাও বাসা পাওয়া যায় না ?"

"কেন ? এখানে কি কোন অসুবিধে হচ্ছে তোমার ?" সুনৃতের স্বরে সামান্য ব্যঙ্গ।

"অসুবিধে যা হচেচ তা তুমি বুঝবে না। তোমরা পুরুষ, বহু মানুষ নিয়ে তোমাদের কারবার। আমরা থাকি অন্দরে, মন আমাদের

ছোট, দৃষ্টি নীচু। আমরা জানতে চাই, পরিষ্কার করে জানতে চাই, সমাজে কোথায় আমাদের স্থান। আমি কি অফিসারের স্ত্রী না কেরানীর স্ত্রী।

"অফিসারের স্ত্রীর মর্যাদা কতটুকু, বল? এ-বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতন হওয়া অসুস্থতা।"

"সচেতন না হয়ে পারা যায় না। তুমি বলবে 'স্নবারি', কিন্তু এটুকু স্নবারি সবারই আছে। তোমার ভূতপূর্ব দপ্তরীকে তুমি আদর করে চেয়ারে বসাতে পার, তাতে তোমার মাহাত্ম্য বাড়ে; কিন্তু তার স্ত্রী যদি কাল এসে আমার সঙ্গে সমান পর্যায়ে আলাপ শুরু করে, আমি কিছুতেই সইব না।"

"তোমার ক্ষতি হবে কিসের?"

"একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। তোমরা দিনরাত পরিশ্রম করো, জীবন থেকে সংগ্রাম করে রসদ কুড়িয়ে আনো। আমরা তাই দিয়ে তোমাদের মর্যাদা, আভিজাত্য তৈরি করি। ছেলেমেয়েদের কাছে তোমার সম্মান, বাপ-মায়ের কাছে হাত পেতে পাওয়া তাদের সামাজিক মর্যাদা, এসব নির্ভর করে কেবল তোমার কর্মে নয়, তার যে-মর্মটুকু নিঙড়ে আমরা পারিবারিক আভিজাত্য বানাই, তার ওপরেও: কেরানীর বৌকে আমি অবহেলা করিনে, ঘৃণা তো নয়ই: তার পূর্ণ মর্যাদা দিতেও আমি সদাই প্রস্তুত; শুধু প্রস্তুত নই তাকে আর আমাকে সমান স্তরে দেখতে। তুমি যে মর্যাদাটুকু আমায় দিয়েছো, তার দাম আমার কাছে এত তুচ্ছ নয়।"

ভোরের আলো না ফুটতেই ছোট্ট পাড়ায় কোলাহলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন শুরু হয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনুশীলা শুনতে পায় পাশের বাড়ি দুটোয় প্রভাতী জাগরণের কলরব। মিরচান্দানী গৃহিণী রাত থাকতে শয্যা ত্যাগ করেন। বড় ছেলে সাতটা বাজবার আগে দোকানে যাবার জন্যে তৈরী হয়—দোকান তার অনেক দূরে, কমলা মার্কেটে। অনুশীলা শুনতে পায় মিরচান্দানী-পরিবারের প্রাতঃকালীন বাক্যালাপ। ভাষা তার অবোধ্য, কিন্তু বুঝতে পারে, বড় ছেলের বৌ

বিছানায় শুয়ে থাকবে, শাশুড়ী উঠে সকালে ছেলের জন্য রুটি বানাবে ঃ এ-নিয়ে রোজ ওদের ঝগড়া। মাঝে মাঝে ঝগড়া বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রায় দিনই কেবল গৃহিণীর গনগন শুনতে পায় অনুশীলা।

বাঁ-দিকের পাঞ্জাবী বাড়িতে সেই মর-মর বুড়ো সারা রাত কাশে। বোধকরি সকাল বেলা তার একটু ঘুম আসে। বাড়িটা প্রভাতে সতর্কভাবে নিস্তব্ধ। অনুশীলা শুনতে পায় বুড়োর ছেলে সন্তর্পণে উঠে সাইকেল নিয়ে দুধ আনতে বেরিয়ে যায়। তার স্ত্রী—যাকে অনুশীলা দুচারবার দেখেছে, ছোট্ট ফরসা, ফ্যাকাসে নির্জীব দেখতে —উঠে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ঘরের কাজকর্ম শুরু করে। তার শাশুড়ী নেই, দুটি সন্তানের জননী সে। দিন-রাত সে কাজ করে— সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, নিঃশব্দে ; তার উচচ কণ্ঠস্বর অনুশীলা কখনও শুনতে পায় না

বিকেল বেলা, অনুশীলা দেখে আশ্চর্য হয়, সে বসে বসে স্বামীর ও সন্তানদের জামা কাপড় নিজের হাতে ইস্ত্রি করে। তার স্বামীর চেহারা সুদর্শন, লম্বা মেদহীন দেহ, রং রোদে-পোড়া গৌর, মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। রোজ সে ধবধবে জামা-কাপড় পরে শৌখিন সাজে দপ্তর যায়। অনুশীলা প্রথম প্রথম ভেবে পায়নি, প্রত্যেক দিন একটা করে শার্ট-প্যান্ট সে পায় কোথায়। পরে বুঝতে পেরেছে, এই শৌখিনতা ক্লান্ত পীড়িত বৌটির অক্লান্ত সেবায়। বৌটিকে কখনও বেরুতে দেখে না অনুশীলা। স্বামী অনেক রাত করে ফেরে। অনুশীলা ভাবে, হয়তো সেও দপ্তরের পরে দোকানে যায়, নয় ব্যবসা করে। পাঞ্জাবী তো, কিছু বলা যায় না।

সকাল একটু সাদা হতে স্কোয়ারের একেবারে শেষতম বাড়িতে লাউড স্পীকার চীৎকার করে ওঠে। প্রথম দিন তো অনুশীলা দস্তুরমত চমকে গিয়েছিল। সস্তা মাইকের কর্কশ ফাটা আওয়াজে অবোধ্য ভাষায় কম্পিত বৃদ্ধ-কণ্ঠ চীৎকার করে কি প্রচার করছিল, আর অনুশীলার মনে হয়েছিল বড় একটা অঘটন ঘটল বুঝি কোথাও।

চমকে উঠে অনুশীলা সুনীতকে ধাক্কা মেরে বলেছিল, "কি হল ?"

সুনীত নিরুদ্বেগে জবাব দিয়েছিল, "গ্রন্থসাহেব।"

বুড়ো শিখ সর্দার, দিনের বেলা বয়সের ভারে নত হয়ে লাঠি নিয়ে চলে, প্রভাতে তারস্বরে গ্রন্থসাহেব পাঠ করে। তা করুক, ভালই তো, কিন্তু মাইক বসিয়ে দু'মাইল সুদ্ধ মানুষদের প্রাতঃকাল এভাবে নষ্ট করার মানে অনুশীলা বুঝতে পারে না। করোলবাগেও মাইক-প্রসারিত গ্রন্থসাহেব পঠন সে শুনেছে প্রথম প্রভাতে; কিন্তু কোলাহল-মুখরিত পাড়ায় হামলা এত ভয়ঙ্কর লাগেনি। পাঞ্জাবীরা আশ্চর্য সহনশীল জাত, অনুশীলা ভাবে। কোন কিছুর প্রতিবাদ করে না। যত অসহ্য অন্যায় হোক, কোই বাৎ নেহি। একটা বিয়ে হলে সমস্ত পাড়ার ঘুম বাজেয়াপ্ত হল। তোমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে তোমার জানালার সঙ্গে সামিয়ানার দড়ি টানানো হল। হঠাৎ দেখলে তোমার বাড়ির সামনের রাস্তায় সামিয়ানার নীচে বরাৎ আহারে বসে গেছে। চলতে চলতে হঠাৎ বাস থামিয়ে, ড্রাইভার রাস্তার দোকান থেকে সবজি কিনবে, বাসসুদ্ধ লোক বিনা প্রতিবাদে তা সইবে। চলন্ত বাস থেকে কন্ডাকটর ধাক্কা মেরে লোক নামিয়ে দিলেও মানুষের প্রতিবাদ নেই। যা হচ্ছে, হতে দাও, কেননা এমন হয়ে থাকে। কোই বাৎ নেহি।

মাইক ভাঙ্গা বিশ্রী সুরে 'জপজি' প্রচার করছে ঃ

ইক ওঁঙ্কার সৎ নাম
করতা পুরেক নির্ভাও নির্বৈর
অকাল মুরদ অ-জুনি সৈ ভ্যাঙ্
গুরু পরসাদ জপ্ আদ সচ্
জুগাদ্ সচ্
হৈ ভি সচ্
হো সি ভি সচ্

শিখদের গায়ত্রী। ঈশ্বর এক। তাঁর নাম একমাত্র সত্য। তিনি কারুর শত্রু নন। কারুর প্রতি দুর্ভাব পোষণ করেন না। তিনি চিরন্তন। তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জন্মান্তর নেই। একমাত্র গুরুর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন, আছেন, চিরদিন থাকবেন।

অনুশীলা বুঝতে পারে না প্রভাতী ধর্ম-চর্চা তারস্বরে

চতুর্দিকে প্রসারিত করবার প্রয়োজন কি। সুনৃত বলে, শিখধর্ম প্রচারমূলক, হিন্দুধর্মের মতো ব্যক্তিসীমিত নয়। তা ছাড়া, স্বাধীন ভারতবর্ষে শিখরা এখনও নিজেদের ভাবগত সম্পূর্ণতা আবিষ্কার করতে পারেনি। যেমন পেরেছে, ধরো, হিন্দী-ভাষীরা। তাই শিখরা গলাবাজি করে নিজেদের কথা সবার কাছে ঘোষণা করতে চায়।

"ভাবগত সম্পূর্ণতা আবার কি?" অনুশীলা প্রশ্ন করে। "সমস্ত ভারতবর্ষে ওরা লুটে পুটে খাচ্ছে। ওদের মতো ভালো অবস্থা তো আর কারুর নয়।"

"তা ঠিক। কিন্তু এ-ঐশ্বর্যে ওদের মন ভরছে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে ওরা পরিশ্রমে, উদ্যোগে, দুঃসাহসিকতায় ও দুর্জয় জীবন-তৃষ্ণায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইম্ফল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ওদের বলিষ্ঠ পদচিহ্ন। কিন্তু, আশ্চর্য লাগে, এতেও ওদের তৃপ্তি নেই, ওরা চাইছে পাঞ্জাবি সুবা।"

কেন চাইছে তা সুনৃতও ভাল বুঝতে পারে না। ভারতমাতা স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্য, বৈভব, সম্পদের জন্যে চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে কি ভীষণ কাড়াকাড়িই না শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিনও সবাই বলত, আমার যা আছে, মা গো, তোমায় দিলাম। আজ সবাই ধারালো লোভে দাবী করছে—তোর যা আছে সব আমাকে দে।

কোথায় যেন সুনৃত পড়েছিল, এ-যুগটা অপচয়ের যুগ। যা আছে সব খেয়ে নিঃশেষ করার যুগ। সবাকার ক্ষুধা বেড়ে গেছে, জীবনের দাবী নদীর প্লাবন। কিন্তু হায়, বসুধার ভাণ্ডারে রসদ নেই। ভারতবর্ষেরও এক অবস্থা। চাহিদা বাড়ছে, মাল নেই। যা আছে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মধ্যপঞ্চাশেই এই অবস্থা! সুনৃত সভয়ে ভাবে, মধ্যসত্তরে আমরা কোথায় দাঁড়াব?

প্রভাতে লাউড-স্পীকারের জুলুম উপেক্ষা করতে পারলে কোণের শিখ-পরিবারকে অনুশীলার মন্দ লাগে না। বৃদ্ধ প্রতাপ সিং বেদী সৌম্যদর্শন; শুভ্রকেশ ও দাড়িতে, এই বার্ধক্যেও অম্লান গৌরবর্ণে, আনত দেহের রাশভারী চলন-ভঙ্গীতে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।

প্রতাপ সিং-এর স্ত্রী বিপুলদেহা, কিন্তু মাংসের ভাঁজে ভাঁজে মুগ্ধকর সারল্য। বিরাট মুখখানা সদা হাস্যময়। চুল পেকেছে, কিন্তু দাঁত পড়েনি ; বিশাল কামিজের নীচে অতিকায় স্তনদ্বয়ের যুগ্মনৃত্য দেখে প্রথম দিন অনুশীলার ভয়ানক হাসি পেয়েছিল। একদিন মন্থরগতিতে গজভঙ্গীতে চলবার সময় সে দেখল, মিলিকে নিয়ে বাঙালি মেয়ে এক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। থামল। মুখের হাসিটি অনুশীলার কেমন ভাল লেগে গেল। সাধারণত এ-পাড়ার কারুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে সে উৎসাহিত বোধ করে নি, কিন্তু এই দেহভার-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা রমণী তার বারান্দার কাছে হঠাৎ থেমে সহাস্য মুখ তুলে পরিচয়ের উদ্যোগ করতে অনুশীলা কেমন বিগলিত হল।

বলল, "বসবেন ? এই মোড়ায় বসুন।"

বড় মোড়া পরিপূর্ণ করে বৃদ্ধা বসল। মিলিকে আদর করতে গেল।

মিলি মা'র গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

"ভয় পাচ্ছে।" বুড়ী অনুশীলার দিকে তাকিয়ে বলল।

"না, না, ভয় পাবে কেন ?" অনুশীলা বিব্রত হল। "ওর স্বভাবই এমনি। নতুন লোকের কাছে যেতে চায় না।"

"ভয় পেলেও দোষ নেই," হাসতে হাসতে বুড়ী বলল। "যা চেহারা!"

তার সারল্যে অনুশীলারও হাসি পেল।

"কিন্তু, বেটি, চিরদিন আমি এমন ছিলাম না। তোমার বয়সে তোমার চেয়েও রোগা ছিলাম আমি। আমার ছোট মেয়েকে দেখেছ ?"

"যে কলেজে যায় ?"

"হ্যাঁ। আলাপ হয় নি বুঝি। একদিন এসো, সবার সঙ্গে আলাপ হবে। ওর নাম তারা। আমার বহুর সঙ্গেও আলাপ হবে। বড় ভালো মেয়ে সুরিন্দর। তারার মতোই দুব্‌লা ছিলাম আমি। এখন হয়তো বিশ্বাস করবে না।"

"কেন করবো না ?"

"আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না!" বুড়ী আবার হেসে উঠল।

"দেহ যে এমন দুশমনী করবে কখনও কি ভেবেছি ?"

"আপনার মেয়ে কোন ইয়ারে পড়ে ?"

"এবছর বি· এ· দেবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে। তারা, সুরিন্দর দুজনেরই। একদিন এসো।"

"যাবো। তার আগে ওদের পাঠিয়ে দেবেন। আমরা তো নতুন। ওদের আগে আসা উচিত।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। উচিত তো বটেই। কি জানো, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কে কার খোঁজ খবর করে ? পাঠিয়ে দেব।"

বুড়ী উঠল অতি কষ্টে, এক হাতে কোমর চেপে, অন্য হাতে বুক।

"এক্ষুনি যাবেন ?"

"চলি, বেটি। নাতনি বায়না ধরেছে পুতুল চাই। বাজার থেকে পুতুল আনতে হবে।"

তারা ও সুরিন্দরকে অনুশীলা অনেকবার দেখেছে। দুজনেই রূপসী। দুরকম রূপ। তারা ছিমছাম কুমারী মেয়ে, রং খুব ফর্সা নয় : মুখখানা বড় সুন্দর। লম্বাটে মুখের আদল, নাতিপ্রশস্ত মসৃণ কপাল, সরু সুগঠিত ভ্রূ, বড় বড় গভীর-কালো চোখ। কেবল নাক সামান্য ছোট। তা ছাড়া মুখখানা একেবারে নিখুঁত। পাঞ্জাবি মেয়েদের তুলনায় চুল তার কালো, কিন্তু হায়, প্রায় পুরুষের মতো ছাঁটা! স্টাইল আছে তারার। কামিজ তার দেহে এমন আঁট-সাট যে শরীরের প্রতিটি ছন্দ প্রস্ফুটিত। স্লিভ-লেস, সুগোল বাহু নগ্ন। কামিজ নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত, দেহের সবটুকু ঐশ্বর্য সযত্নে ফুটিয়ে। তারার পোশাক দেখে অনুশীলার ওর সম্বন্ধে প্রথম কৌতূহল জেগেছিল। এই নি-রং কেরানী-পাড়ায় তারা বর্ণের ঝড়। পয়ার ছন্দের বিনীত জীবনে তারা ঝাঁঝাল আধুনিক কবিতা। সে যখন বাইরে আসে, পঁচিশটে বাড়ির জানালা, দরজা, বারান্দা থেকে বহু নারী-পুরুষের চোখ তাকে অনুসরণ করে। তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কাউকে দেখেও দেখে না!

সুরিন্দর অন্যধরনের সুন্দরী। দীর্ঘাঙ্গী, এত ফর্সা যে হঠাৎ চোখ ঝলসে যায় তাকালে। বেশির ভাগ সময় সে শাড়ি ব্যবহার

করে। পাতলা সিল্কের আবরণে তার গোলাপী যৌবন প্রতিভাত। পরিপাটি বেশ সুরিন্দর। অত ফর্সা মুখেও সযত্নে প্রসাধন লাগায়, অধরোষ্ঠ টুকটুকে রঙিন করে। পাতলা সিফন, জর্জেটের স্বল্পাবরণ তার যৌবনশ্রী ঘোষণা করে। সুরিন্দর সদা-সচেতন সুন্দরী। পুরুষের চোখের ঝিলিক সে উপভোগ করে। চলবার সুললিত ভঙ্গিমা সে আয়ত্ত করেছে। প্রতি পদক্ষেপে তার দেহ তরঙ্গিত।

সুনৃত বলে, মহিলা অতিশয় অশালীন।

অনুশীলা সায় দেয়। তবু, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সুরিন্দর তাকে আকর্ষণ করে।

যেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা প্রথম দেখতে পেল তারা ও সুরিন্দর এক সঙ্গে সেজে-গুজে বাইরে যাচ্ছে, অনুশীলা বলে উঠেছিল, "দেখ, দেখ, কি সুন্দর দুটি মেয়ে!"

সুনৃত বলেছিল, "কেরানী-পাড়ায় জীবন্ত উপদ্রব।"

"কেরানী-পাড়ায় বুঝি সবাইকে কেরানী-পোশাক পরতে হবে!"

"অন্য পাড়ায় যাওয়া উচিত এদের।"

"কেন?"

"সব পাড়ারই একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এ-পাড়ায় ওরা আছে, তোমার নজরে পড়ল। সুন্দর-নগর বা গল্‌ফ লিংক্‌স্‌-এ হলে নজরে পড়ত না।"

"নিশ্চয় পড়ত। সৌন্দর্য সর্বদা চোখে পড়ে।"

"আধুনিকাদের সৌন্দর্য কতটা মৌলিক, কতখানি নির্মিত, বোঝা কঠিন।"

"সে পুরুষদের পক্ষে। আমরা তাকালেই বুঝতে পারি। ওরা প্রকৃত সুন্দরী।"

"তবে এমন উটকো সেজেছে কেন!"

"বাঃ, সাজবে না।"

"এমনি করে সাজবে! সালোয়ার-কামিজ অত্যন্ত ভদ্র, শালীন পোশাক। তাকে দর্জির কেরামতিতে অশ্লীলতার চরমে এনেছে। তার ওপর ঐ পুরুষ-ছাঁট চুল, দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। আর উনি তো শাড়ি পরেছেন দেহ ঢাকতে নয়, দেখাতে!"

অনুশীলা আক্ষেপ করে বলেছিল, "চুল যে কেন ওরা ছেঁটে ফেলে বুঝতে পারি নে।"

"মনের অশান্তিতে।"

"কি বললে! ঐটুকু মেয়ের মনে অশান্তি!"

"ওর নয়, ওদের সবার। ওরা জানে না ওরা কে, কেন, কোথায়, কি। নিজেদের ঐতিহ্য বলতে ওদের কিছু নেই। প্রাচীন কাল থেকে যতো হামলাকারী ভারতবর্ষে এসেছে, পদানত হয়েছে ওরা সবার আগে। বিদেশী ওদের সব লুটে নিয়ে গেছে। গ্রীক, মোঙ্গল, ইরানী, আফগানী, তুর্কীর রক্তে ওদের দেহ মজবুত হয়েছে, শ্রী বেড়েছে, কিন্তু অন্তর গেছে শূন্য হয়ে। তাই দেশ স্বাধীন হতেও ওরা নিজেদের কোন দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে না। ভেসে বেড়াচ্ছে। মেহনত করে যেমন ওদের বাস্তব সম্পদ বাড়ছে, তেমন আধ্যাত্মিক সম্পদ কমে যাচ্ছে। তাই ওদের উদ্ভট ফ্যাশন, ফাস্ট লিভিং, ইংরেজ-মার্কিন-জীবনযাত্রার অনিপুণ অনুকরণ। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীও কথা বলে ইংরেজিতে, তা যত অশুদ্ধ হোক না কেন। সন্তানরা মা-কে বলে, মাম্মি, বাপকে, ড্যাডি। চাকর গিন্নিকে বলে, মেমসা'ব। মাঈজি বললে চাকরি যায়!"

সুনৃতের কথা মানলেও তারা-সুরিন্দর সম্বন্ধে অনুশীলার কৌতূহল থেকে গেছে। সুনৃত যে সুরিন্দরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় নি তাতে অনুশীলা খুশী! মনে মনে ভেবেছে, আলাপ হলে সুরিন্দরেব সাজসজ্জার কায়দা-কানুন এক আধটু দেখে নেবে।

তাই, যেদিন ওরা বেড়াতে এল, অনুশীলা বেশ উৎসাহের সঙ্গে ওদের বসাল।

তারা কথা বলে কম, কিন্তু সুরিন্দর চটুল, যেমন দেহে তেমনি বাক্যে। আলাপ জমে উঠল।

অনুশীলা জানতে পারল সুরিন্দরের স্বামী কনট্রাক্টর; নিজেদের বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে ডিফেন্স কলোনীতে, দু'তিন মাসে ওরা এখান থেকে চলে যাবে।

"কনট্রাক্টার? তাই বলুন! তা হলে আপনারা এখানে বাড়ি পেলেন কি করে?"

"উনি আসলে সরকারী আফিসে স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। কয়েক বছর আগে কনট্রাক্টারি শুরু করেন। এখন আর দপ্তরে যান না। বছর খানেক বিনে মাইনেয় ছুটিতে আছেন। এবার চাকরি ছেড়ে দেবেন।"

"স্টেনোগ্রাফার থেকেও কনট্রাক্টারী করতেন? তা বুঝি করা যায়?"

"ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছু করা যায়।"

"বিল্ডিং কনট্রাক্টার?"

হ্যাঁ। অনেক বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরি করেছেন। নিজেদের বাড়িটাও তৈরি হয়ে গেল।"

অনুশীলা তারাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবেন?"

"দেবার কথা।"

"দেবেন না?"

"তৈরি হতে পারলে দেব।"

"কোন কলেজ আপনার?"

"মিরান্দা হাউস।"

"অনার্স নিয়েছেন?"

"পাস কোর্সেই হাবুডুবু খাচ্ছি!"

"আপনাকে দেখলে হাবুডুবু খাবার মেয়ে মনে হয় না।" অনুশীলা মুচকি হেসে বলল।

সুরিন্দর বলে উঠল, "তারা হাবুডুবু খায় না, খাওয়ায়।"

"চুপ করো, ভাবী!" ধমকে উঠল তারা।

"তারার দোষ কি?" বলল অনুশীলা।

"দোষ লোভী ছোকরাগুলোর। আমরা তো ওকে বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি", সুরিন্দর বলল।

"তাই নাকি?"

"না হয়ে উপায় কি? য়ুনিভার্সিটি সমাজে তারা-নামক ব্যাধিতে নাকি অর্ধেক ছেলে পীড়িত। আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে তো।"

আরক্ত তারা প্রতিবাদ জানালো।

"মুশকিল তারাকে নিয়ে।" সুরিন্দর থামল না। "বিয়ে করতে রাজী নয়।"

"কেন?" অনুশীলা প্রশ্ন করল।

সুরিন্দর কিছু একটা বলতে গিয়ে তারার চোখে চোখ পড়তে থেমে গেল।

অনুশীলা তারাকে বলল, "একটা কথা বলবেন? আপনি এতো ছোট করে চুল কাটলেন কেন?"

তারা বলল, "এমনি।"

"বড়ো চুল ভালো লাগে না আপনার?"

"আমাদের চুল বড়ো হয় না।"

"আপনার চুল তো বেশ কালো।"

"বাড় নেই।"

"বব্‌ করতে তো পারতেন?"

"ও সবাই করে।"

"এ যেন কেমন পুরুষ-পুরুষ দেখায়।"

সুরিন্দর বলল, "তারা জানে ওকে একটুও পুরুষ-পুরুষ দেখায় না। যাতে না দেখায় তার ব্যবস্থা বেশ যত্নের সঙ্গে করে থাকে।"

অনুশীলা মনে মনে বলল, বৌটা ভারি অসভ্য!

সুরিন্দর প্রশ্ন করল, "আপনার স্বামী কি করেন?"

"এনজিনীয়র।"

"এ-পাড়ায় বাসা পেলেন যে!"

"আউট-অব-টার্ন।"

"আপনার চুড়ির প্যাটার্নটা বেশ। কলকাতায় তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

"এখানকার স্যাকরারা এত সূক্ষ্ম প্যাটার্ন তুলতে পারে না।"

"আপনাদের গহনা বেশ ভারী হয়ে থাকে। আমরা কম সোনায় পাতলা গহনা করাই, তাই প্যাটার্নের দিকে নজর দিতে হয়।"

"বঙ্গাল দেশের তাঁতের শাড়ি খুব সুন্দর। আপনি কোত্থেকে কেনেন?"

"বেশির ভাগ কলকাতা থেকে। এখানেও মাঝে মধ্যে পাই। কলকাতা থেকে এক তাঁতী আসে।"

"যদি দু'এক মাসের মধ্যে আসে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তো।"

"কিনবেন ?"

"ইচ্ছে আছে।"

তারা বলে উঠল. "তুমি পরবে তাঁতের শাড়ি ?"

"নয় কেন ?"

"ওতে বড় বেশি ঢাকা পড়ে।" তারা এক হাত প্রতিশোধ দিল।

সুরিন্দর দমবার পাত্র নয়। বলল, "দুষ্টু মেয়ে! ঢাকতে না চাইলে কোন শাড়িতেই ঢাকা পড়ে না।"

অনুশীলা অস্বস্তি বোধ করল। এ-ধরনের অশ্লীলতা কখনও সে শোনে নি। খারাপ হোক না কেন, এর ঝাঁঝাল নেশাটাও তার কম মজার লাগল না।

সুরিন্দর জিজ্ঞেস করল, "পাড়ায় আলাপ হয়েছে সবার সঙ্গে ?"

"কোথায় আর হল !"

"পাশের বাড়ি ?"

"বুড়ী একদিন এসেছিল।"

"ওর মেয়ের সঙ্গে ?"

"না

সুরিন্দর সরবে হেসে উঠল।

"হাসলেন যে !"

"মেয়েকে দেখেছেন ?"

"দেখবো না ? পাশের বাড়ি।"

"কি মনে হল ?"

"কিছু না।"

"ওরা সিন্ধী !"

"তা জানি।"

"মেয়েটা এখনও আলাপ করতে আসে নি ?"

"না। উৎসাহ দেখাই নি।"

"ভালো করেছেন।"

"সুরিন্দর আবার হাসল। তারা গম্ভীর হয়ে একটা ম্যাগাজিনের ছবি দেখতে লাগল।"

"কেন বলুন তো!"

"সাবধান করে দিচ্ছি। সিন্ধী মেয়েরা পুরুষ-সন্ধানী।"

"তাই নাকি?"

"দেখেন না, মেয়েটা কতো রাত্রে বাড়ি ফেরে!"

"তাই বুঝি? খেয়াল করি নি তো!"

"অনেক রাত্রে। মা আস্তে দরজা খুলে দেয়। মাঝে মধ্যে রাত্রে ফেরেই না।"

"না, না। তা কেন হবে?"

অনুশীলার ভাবভঙ্গীতে সুরিন্দর খিলখিল হেসে উঠল। এবার তারাও হাসল।

"খেয়াল করলে ও-বাড়িতে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।"

"একটা ছেলে তো পাগল!"

তারা হঠাৎ চমকাল। বলে উঠল, "কে বলেছে?"

"বুড়ী নিজেই বলল।"

সুরিন্দর কেমন বিরত হল। সে যেন এ-প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়।

তারা জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওকে দেখেছেন?"

"দেখেছি। এমনি তো বেশ শান্ত।"

এবার সুরিন্দর বলল, "খুব ভাল ছেলে ছিল। ও যদি পাগল হয়ে থাকে, তার জন্যে দায়ী ওর বাড়ীর লোক।"

"সে কি? তা কি সম্ভব?" আঁতকে উঠল অনুশীলা।

তারা গম্ভীর গলায় সংক্ষেপে বলল, "ও পাগল নয়।"

সুরিন্দর বলে উঠল, "কয়েক বছর আগে মেয়েটাকে নিয়ে মহা কেলেঙ্কারী হয়েছিল।"

"কিসের কেলেঙ্কারী!"

"সিন্ধীদের ব্যাপার! এক সাধু এসে হাজির হল ও-বাড়িতে। শোনা গেল ঐ মেয়েটা, যার নাম অমৃত, নাকি ভগবানের আধার। তার মাধ্যমে ঈশ্বর-বাণী উচ্চারিত হয়। রোজ এ-বাড়িতে সন্ধে

বেলা আসর বসত। কত লোকের ভিড়। মেয়েটাকে শুধু একটা শেমিজ পরিয়ে মাঝখানে বসানো হত। সবাই একত্রিত হলে সাধু 'ধ্যানে' বসতো। নিশ্চয় হিপ্‌নোটাইজ্‌ করতো মেয়েটাকে, সে কেমন 'ভাবস্থ' হয়ে যেত। তখন উপস্থিত সবাই প্রশ্ন করত, সে জবাব দিত। প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে ঈশ্বর-সেবার জন্যে দু' আনা।"

"বলেন কি ?"

"এমনি চলল বেশ কিছু দিন। তারপর একদিন ছেলেটা ক্ষেপে গেল।"

"কেন ?"

"সাধুর সঙ্গে মেয়েটার ঐশ্বরিক আদান-প্রদান সহ্য করতে পারল না।"

দম বন্ধ করে অনুশীলা বলল ঃ "কি সর্বনাশ ! তারপর ?"

"একদিন ছেলেটা দারুণ হৈ চৈ শুরু করল। সাধুকে মেরে ধরে বাড়ি থেকে তাড়ায় আর কি। তখন বাড়ির সবাই মিলে ওকেই মেরে ঠাণ্ডা করল।"

"না, না। এ হতে পারে না," অনুশীলা চিৎকার করে উঠল।

"তারপর থেকে ছেলেটা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের পর দিন নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। কারুর সঙ্গে কথা বলে না, চুপচাপ থাকে। পড়াশোনা বন্ধ। ওরা বলল, "মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"মাথা খারাপ হয় নি তাহলে ?"

"কে জানে ? খুব সুন্দর স্বভাব, গম্ভীর প্রকৃতির ছিল ছেলেটা। পরিবারের সবার থেকে আলাদা। বোধ হয় ওকে কিছু খাইয়েছিল ওরা।"

"এ হতেই পারে না। নিজের বাপ-মা-ভাই-বোন তো !"

সুরিন্দর বিদগ্ধ হাস্যে অনুশীলার সরলতাকে ব্যঙ্গ করল।

"একদিন সাধুর সঙ্গে মেয়েটা পালাল।"

অনুশীলার মুখে কথা সরল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"বাড়ির লোকেরা বলল, ভগবানের আদেশে ওরা অন্যত্র ধর্ম-প্রচারে গেছে।"

"ছেলেটা ?"

"ছেলেটা একেবারে নীরব হয়ে গেল। একটা কথাও বলে না কারুর সঙ্গে। কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিল। চুপচাপ বাড়ি বসে থাকে। ওরা বলল, ওর মাথার দোষ।"

অনুশীলা বলল, "ওর মা বললেন, পার্টিশনের সময় খুন-খারাপি দেখে—।"

সুরিন্দর হেসে জবাব দিল, "ওটা গল্প।"

"মেয়েটা ফিরে এল কবে?"

"দু বছর আগে।"

"সাধুর সঙ্গে?"

"না। একা। এসেই চাকরি পেয়ে গেল।"

"ধর্মকর্ম—।"

"শিকেয় উঠল। এখন সে অন্য কর্মে ব্যস্ত।"

সুরিন্দর আবার হেসে গড়াল।

"আপনার ভদ্রলোককে সাবধানে রাখবেন।"

"কেন?"

"শুনেছি পুরুষধরার অনেক মন্ত্রতন্ত্র সাধুর কাছে শিখে এসেছে।

অনুশীলা সে-কথা কানে তুলল না।

"ছেলেটা তাহলে পাগল নয়! আমি তো বড্ড ভয় পেয়েছিলাম। পাশের বাড়িতেই একটা পাগল—কি ভয়ানক ব্যাপার বলুন তো।"

তারা আবার আস্তে বলল, "ও পাগল নয়।"

অনুশীলা বলল, "আমার যেন বিশ্বাস হয় না মা-বাবা-ভাই-বোন এমন কাজ করতে পারে?"

সুরিন্দর বলল, "সিন্ধীদের তো জানেন না!"

"ছেলেটাও তো সিন্ধী। তাকে তো আপনারা খুব ভাল বলছেন।"

"ছেলেটা খুব ভাল ছিল। তারাকে জিজ্ঞেস করুন।"

তারা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

অনুশীলা বলল, "ছেলেটা তো বিয়ে করতে চায়।"

তারা, সুরিন্দর দুজনেই চমকে উঠল।

"কি বললেন ?"

"ওর মা একদিন এসেছিল। আমরা আসবার সপ্তাহখানেক পরে। নিজেই ছেলের প্রসঙ্গ তুলল। কথায় কথায় বলল, ছেলেটা বিয়ে করতে চাইছে।"

তারা, সুরিন্দর দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

তারা উঠে দাঁড়াল।

"চলো, ভাবী। এবার যাই।"

"চল্।" যেতে যেতে সুরিন্দর বলল, "আসবেন আমাদের বাড়ি। কর্তাকে নিয়ে আসবেন।"

অনুশীলা একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "যাবো।"

ওরা চলে গেলেও দরজায় অনুশীলা দাঁড়িয়ে রইল। মাথা ঝিম ঝিম করছে। পাশের সিন্ধী পরিবারকে ঘিরে বিরাট রহস্য ; তার কিনারা সে পেল না। কর্কশ, কঠিন, পুরুষালি বৃদ্ধা মহিলা মা হয়ে ছেলেকে পাগল করিয়েছেন, এ-কাহিনী যেমন ভয়ঙ্কর, তেমন অবিশ্বাস্য। মেয়েটা যে ভাল নয় তা অনুশীলা জানতে পেরেছিল চেহারা চালচলন দেখেই। আজ মনে হল বাড়ি দেখবার দিন যে পুরুষ চক্ষুর দৃষ্টিতে সে আহত হয়েছিল তা যে পাগল ছেলেটার তার প্রমাণ নেই। বড় ভাই কিম্বা বুড়ো বাপেরও হতে পারে। তথাপি পাগল প্রতিবেশীর ভয় অনুশীলার একেবারে গেল না।

বারোটা বাজে। অনুশীলা সুনৃতের সঙ্গে খেয়ে নেয়, মিলিকেও খাইয়ে দেয়। দশটা থেকে তার একটানা অবসর। এগারটা বাজতে মিলি ঘুমিয়ে পড়ে। উঠতে উঠতে দুটো। এ-সময়টা অনুশীলারও বিশ্রাম। মিলি উঠলে আর বিশ্রাম হয় না। ওকে যথাসম্ভব খেলায় ব্যস্ত রেখে অনুশীলা কিছু-না-কিছু কাজ নিয়ে বসে।

আজ দুপুরে মনের অস্থিরতা দমন করার তাগিদে বসল সেলাইয়ের কল নিয়ে। সুনৃতের পায়জামা সেলাই করতে হবে। নিজের কয়েকটা ব্লাউজের কাপড় পড়ে আছে। সেদিন সুনৃত হঠাৎ আপিস থেকে ফেরবার পথে মিলির জন্যে একটা জাপানী ফ্রকের কাপড় নিয়ে

এসেছে। বেশ সুন্দর। অনুশীলা তিন চারদিন কনট্ প্লেসের দোকান ঘুরে ফ্রকের নূতন ডিজাইন দেখে এসেছে। কোনটা পুরো পছন্দ হয়নি; মনে মনে তিনটে ডিজাইন মিলিয়ে একটা মৌলিক ডিজাইন দাঁড় করিয়েছে: কাগজে কেটে বেশ পছন্দ হয়েছে। এ-সব কাপড় জড়ো করে কয়েক ঘণ্টার সেলাই নিয়ে অনুশীলা বসেছিল।

সেলাই খানিকটা অগ্রসর হতে দরজায় করাঘাত হল।

অনুশীলা জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি বহিন্‌জি।"

সেই কর্কশ, গম্ভীর গলা। মিসেস মিরচান্দানি!

অনুশীলা ভাবল, দরজা খুলবে না। পরিবারটা ভাল নয়, নোংরা। যে-রহস্যের জমাট অন্ধকার ওদের ঘিরে আছে তাতে দুর্নীতি, অন্যায়, পাপের বিষাক্ত কীট বিচরণ করছে। কিন্তু দরজা না খোলবার নগ্ন অভদ্রতা অনুশীলা দেখাতে পারল না। ঠিক করল দরজা থেকে বিদায় করে দেবে সিন্ধী মহিলাকে। ঘরে এনে বসাবে না।

দরজা খুলে অনুশীলা স্তম্ভিত হল।

মহিলার সঙ্গে সেই পাগল ছেলেটা।

আজ খুব একটা ভয় পেল না। তবু একবার কেঁপে উঠল। দরজা আগলে সে বলল, "কি চাই আপনাদের?"

মিসেস মিরচান্দানি সহজে কিছু বলতে পারলেন না।

অনুশীলা আবার বলল, "কি চাই?"

মহিলা এবার আস্তে আস্তে বললেন, "একটু কাজ আছে।"

"কি কাজ?"

"সন্তোষ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

অনুশীলার মেজাজ বিগড়ে গেল—পাগল ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, আর, ন্যাকা, তুমি তাকে নিয়ে এসেছ দুপুরের নির্জন বাড়িতে একা আমার কাছে?

"আপনার মতলব কি?" জোর দিয়ে বলল অনুশীলা। "দুপুরে, আপনি জানেন, আমি একা থাকি। এ-সময় আপনার পাগল ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে চড়াও করার মানে কি? পুলিসে খবর দিলে সুখী

ঃবেন ?"

মহিলা, অমন জবরদস্ত মহিলা, একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। কণ্ঠস্বর সাধ্যমত মোলায়েম করে মিনতি জানালেন ঃ

"বহিনজি, মাপ করবেন। আমি জানি, কাজটা গর্হিত হয়ে গেছে। কি করবো ? ও আসবেই আপনার কাছে। একাই আসবে। কিছুতেই আটকাতে পারলাম না। তাই নিজে নিয়ে এলাম। মা আপনি. মার অবস্থা তো বোঝেন !"

এবার অনুশীলা ভয় পেল। আসবেই! একাই আসবে ? ভয়ে ভয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে। বছর চব্বিশ বয়স হবে। শান্ত সুশ্রী মুখখানা। মাটির দিকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা মতন, মাঝারি দৈর্ঘ্য, পাতলা লালচে চুল, অনেকদিন কাটেনি। কান প্রায় ঢেকে গেছে চুলে।

দেখলে মনে হয় না, বিপজ্জনক। বরং কেমন মায়া লাগে। বুদ্ধিমান মুখখানা। কিন্তু, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল অনুশীলা, ও পাগল। ওকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

সে বলল, "আপনারা যান। এমনি করে আমায় বিরক্ত করবেন না।"

এবার ছেলেটি চোখ তুলে চাইল। অনুশীলা দেখতে পেল তার বড় বড় সহজ সরল চোখে অব্যক্ত বেদনা। কালো মেঘে যেমন বিদ্যুতের ঝিলিক, তেমনি যৌবনের ঝিলিক আসছে ব্যথাতুর চোখ থেকে।

"আপনার কাছে মাপ চাইছি, দিদি", ছেলেটি আস্তে আস্তে বলল। তার কণ্ঠস্বর স্বচ্ছ, উচ্চারণ পরিষ্কার। "আমার দুটো কথা আছে। বলতে দিন।"

পাগলের মত তো মনে হল না। অনুশীলা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে শুধু বার হল ঃ "বলুন।"

"ও-বাড়ির তারা আপনার কাছে আসে ?"

"আজকেই প্রথম এসেছিল।"

"আবার আসবে ?"

"তা তো জানি নে।"

"ওরা কি বিশ্বাস করে আমার মাথা খারাপ ?"

অনুশীলা সন্তোষের চোখে তাকাল। মনে হল তার জীবনের সবটুকু প্রেরণা, অর্থ. অভিজ্ঞান উত্তরের অপেক্ষায় ব্যাকুল।

সে বলল. "না।"

ফুটন্ত গোলাপের মত সস্মিত হল মুহূর্তে সন্তোষের মুখ। অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল।

নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার প্রশ্ন করল. "তারা ?"

অনুশীলা বলল. "মনে হল না. বিশ্বাস করে।"

সন্তোষ আরও শক্ত করে নিজেকে সামলে নিল।

বলল, "ধন্যবাদ, দিদি। মাপ করবেন। নমস্তে।"

চলে যাবার মুখে সহসা ফিরে দাঁড়িয়ে, আস্তে নিজের মনে আরও বলল, "আমি পাগল নই।"

মিসেস মিরচান্দানি নিস্পন্দ, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনুশীলা তখনও আহত বুদ্ধি ও দলিত চেতনার টুকরোগুলি গুছিয়ে নিতে পারেনি। শুধু তার মনের মধ্যে বার বার মৃদু উচ্চারিত হতে থাকল ঃ কৈ। পাগল তো নয় !

"বড় বিপদে পড়েছি, বহিনজি।"

মিরচান্দানি-জায়ার কণ্ঠস্বর শুনে অনুশীলার খেয়াল হল, তিনি যাননি !

"কিসের বিপদ ! মনের কঠিনতা প্রশ্নে প্রতিফলিত হল।

"সন্তোষকে নিয়ে।"

অনুশীলা মেজাজ রাখতে পারল না। "বিপদ তো আপনাদের তৈরি। একটা সুস্থ সবল ছেলেকে, নিজের ছেলেকে, পাগল বলে চালিয়ে যাচ্ছেন ? এ কি সম্ভব ? কেমন ধারা বাপ-মা আপনারা ?

মহিলা বাজে-পোড়া তালগাছের মত কঠিন নীরব নির্জীব দাঁড়িয়ে রইলেন। অনুশীলা দেখল তাঁর পুরুষালি মুখের গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নামছে।

সে তপ্ত অশ্রুতে অনুশীলার মন ঠাণ্ডা হল না।

সে বলে চলল, "আপনাদের পরিবারের জীবনযাত্রা, কেলেঙ্কারী

কেচ্ছায় আমার কোনও ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু আপনি তো মা! এমনি একটা তাজা জোয়ান সুস্থ ছেলের জীবন নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে আপনি কি করে যোগ দিলেন?"

মিসেস মিরচান্দানি এবার বললেন. "আমি কিছু করিনি।"

"নিশ্চয় করেছেন।" অনুশীলার আত্মশাসন রইল না। "আপনি নির্দোষ একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"আমি নির্দোষ নই।" নিজের মনেই বললেন মিসেস মিরচান্দানি। "তাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি শাস্তি আমাকেই পেতে হচ্ছে।"

এখন আর তাঁর চোখে অশ্রুবিন্দু নেই। অনুশীলা দেখল তাঁর চোখ. মুখ. জ্বলন্ত দগ্ধ মরুভূমি। তার তাপ এসে অনুশীলার মুখে লাগল। সরে গেল সে. কে যেন তাকে সরিয়ে দিল।

মিসেস মিরচান্দানি বললেন, "সুরিন্দর কাউর বুঝি তোমাকে সব বলে গেছে?"

"বলবে না কেন?" অনুশীলার কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ।

"সব কথা নিশ্চয় বলেনি।"

"সব কথা শোনবার রুচিও নেই আমার।"

অনুশীলার আঘাত মিরচান্দানি-জায়াকে স্পর্শ করল না।

তিনি পাথরে পাথর ঠোকার মত প্রত্যেকটি শব্দ নিক্ষেপ করলেন: "নিশ্চয় বলেনি, ওর স্বামী-শ্বশুর একত্র ব্যবসার নামে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে দিয়েছে? নিশ্চয় বলেনি ওরাই ব্যবসার নামে অমৃতকে প্রথম কুপথে নামিয়েছিল? বলেছে কি আমাদের সর্বস্ব লুটে নেওয়ার পর অর্থ রোজগারের যে-পথ অমৃতর বাবা ও বড় ভাই গ্রহণ করতে বাধ্য হল. তার মূলেও ওরই শ্বশুর ও স্বামী? সুরিন্দর কাউর নিশ্চয় বলেনি, তার স্বামীর কনট্রাক্ট পাবার জন্যে কাদের সঙ্গে ওর রাত কাটাতে হয়! সব কথা নিশ্চয় তোমাকে বলেনি সুরিন্দর কাউর।"

অনুশীলা নিথর অন্ধকারের মত জমে গেল। বুদ্ধি ও চেতনা আবার লোপ পেল। কোনও কথা মুখে এল না।

মিসেস মিরচান্দানি বলে যেতে লাগলেন. "এক সময়ে দু-

পরিবারে আমাদের গভীর সদ্ভাব ছিল। শেষে তাই কাল হল। আমাদের সমস্ত সর্বনাশের মূল ওরা। ঐ পাঁচকে মেয়ে তারাকে দিয়ে সন্তোষকে একেবারে হাত করে নিয়েছিল। আমার স্বামী ব্যবসায় ঠকে গিয়ে আদালত পর্যন্ত করতে পারে নি এই সন্তোষের জন্যে। ছেলে জানিয়ে দিল, আদালত করবে তো আমি আত্মহত্যা করব। বাবা নিরস্ত হল, কিন্তু ক্ষমা করল না। পরে যখন সাধুর ব্যাপারটায়ও সন্তোষ বাড়াবাড়ি লাগাল, বাপ-ভাই-আর-সাধু মিলে কি-সব ওকে খাওয়াল, ওর শক্তি ফুরিয়ে এল, নিস্তেজ নির্জীব, নীরব হয়ে গেল। ও-যে মরে যায় নি সে কেবল আমার জন্যে; এখন আবার ওর বড় ভাই-এর ব্যবসা চলছে, সে দুর্দিন আর নেই, ওর প্রতি বাপ-দাদার মনও নরম হয়ে এসেছে। কিন্তু ও তো ঘরের দুশমন। ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার জিদ ধরেছে, তারাকে বিয়ে করবে।''

অনুশীলা সব বুঝতে পারল না, শুধু বুঝল সম্মুখে তার অফুরন্ত অন্ধকার ; স্তরের পর স্তর কুৎসিত রহস্য। সে অন্ধকারের তরঙ্গ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইল। পারল না।

মিসেস মিরচান্দানি বলে চললেন, "কাকে দোষ দেব? দোষ কপালের। আমাদের কারুর জীবনই এমন ছিল না। দেশ ভাগ হবার আগে যে-যার স্বস্থানে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাত। তারপর এল সেই ভয়ানক দুর্যোগ। আমাদের সবাকার জীবন তচনচ্ হয়ে গেল। ছিন্নমূল আহত দগ্ধ আমরা হিন্দুস্থানে নিক্ষিপ্ত হলাম। আবার শুরু হল জীবন-গড়ার লড়াই। যুদ্ধে নীতি বলে কিছু নেই। যে যেমনি করে পারল, যা-কিছু হাতের কাছে পেল গুছিয়ে নিল। আজ যে ওপরকার এত জৌলুস দেখছ, ভেতরে কি আছে একমাত্র ঈশ্বর জানেন। কাকে দোষ দেব? দোষ নেই কারুর। দোষ ঐ ভগবানের। আমাদের ভাগ্যের। আর দোষ এই মহা কুকালের।''

বলতে বলতে তিনি নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রিবেলা বকুনি খেল অনুশীলা সুনৃতের কাছে।

"সবার কেচ্ছা শুনছ, আর একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উস্কে

দিচ্ছ।"

"মোটেই না।"

"তা ছাড়া কি? সর্দার মেয়ে দুটোকে খাতির করার কি দরকার ছিল?"

"বাঃ। বেড়াতে এলে বসতে দেব না?"

"নিশ্চয় দেবে। কিন্তু পরচর্চা করবে না।"

"পরচর্চা কখন করলাম? ওরা বলল, আমি শুনলাম।"

"সিন্ধীকে ওসব বলতে গেলে কেন?"

এবার অনুশীলা রাগল।

"তুমি তো বলবেই। সারাদিন নিজের তালে আছ। সকালে বেরিয়ে যাও, ফেরো সন্ধেয়। বৌ-মেয়েকে এনে ফেলেছো এমন এক পাড়ায় যেখানে মানুষ বাস করে না। পাগল, লম্পট, চোর, মর-মর কেশো রুগী, ডাইনীবুড়ী, এসব নিয়ে আমাকে সারাদিন একা কাটাতে হয়। একটা মানুষ পাইনে যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে একটু কথা বলা যায়।"

অনুশীলার চোখের জলে সুনৃত নরম হল, কিন্তু হার মানল না।

"কথা তো কম বলছো না, দেখতে পাচ্ছি। এবার একটু কম বোলো।"

শীতের শেষাশেষি সুনৃত-অনুশীলা এ-পাড়ায় এসেছিল। মার্চ মাসে রোদের তাপ বেড়ে যায়, কিন্তু সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি বেশ মিঠে ঠান্ডা থাকে। শীতে শিবাজী স্কোয়ারের সবুজ মাঠে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পেশোয়ারী পরিবারগুলো যে পরম রৌদ্র-প্রিয়তা নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেয় অনুশীলা তা দেখতে পায়নি। কর্তারা দপ্তরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবার চারপয় বার করে রোদে এসে বসে। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ মাঠ ছাড়ে না। রোদে বসে তাদের মধ্যাহ্ন আহার, রোদে বসে তাদের বাক্যালাপ, উল বোনা। হাত-পা ছড়িয়ে সব বসে, গাল-গল্পের সঙ্গে হাসে, ঝগড়া করে, চেঁচায়। বারোটা বাজলে ঘরে গিয়ে রুটি তরকারী মাঠে নিয়ে আসে।

কাগজের টুকরো বা বাসন পেতে যে-যার খাবার খেয়ে নেয়—ঘি-মাখানো নরম মোটা রুটি, সবজি, কাঁচা মুলো বা টমাটো, কাঁচা পেয়াজ, গাজর, বীট, আচার। রান্নার মধ্যে একক সবজি, তাও বেশির ভাগ এক তরকারীর। সরষে শাক সেদ্ধ করে ঘুটে ঘুটে আস্বাদপূর্ণ সুজির মত খাদ্য তৈরি হয়, তাতে বেশ একটু তাজা ঘি ঢেলে দেয়। নয়তো ফুলকপির ফুল দিয়ে সবজি বানায়। ডাল যদি হবে তো সবজি দরকার নেই। খাওয়া শেষ হলে মাঠেই অল্প জলে কোনও মতে মুখ ধোয়। মাঠ ভরতি আহারের অবশিষ্ট—কাগজ, শালপাতা, টুকরো রুটি পড়ে থাকে : কুকুর ভিড় করে। শিশুরা খেয়ে দেয়ে খেলা করে, খেলতে খেলতে ঘাসের উপর ঘুমিয়ে থাকে ; মা-রা বড় একটা কেয়ার করে না।

মার্চ মাসেও অনুশীলা দেখেছে দু'একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক দুপুর কাটতেই অপরাহ্নের কোমল রোদে চারপয় বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে, বা ঘাসে বসে উল বুনছে।

এপ্রিল আসতে মাঠে বিছানা। বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতীয়রা মে মাসের দারুণ গরম পড়বার আগে বাইরে শুতে চায় না। কিন্তু পাঞ্জাবী-সিন্ধী-পেশোয়ারীদের প্রথম সুযোগে বাইরে শোবার অভ্যেস। কেউ কেউ লেপ মুড়ি দিয়ে মার্চ মাসেও বাইরে শোয়। এপ্রিলে সন্ধে হতে দপ্তর-ফেরত গৃহকর্তা, গিন্নি ও ছেলেমেয়েরা বারান্দার সংলগ্ন মাঠের অংশ জলসিক্ত করে। তারপর খাটিয়া পাতে। পরপর প্রত্যেকের জন্য বিছানা তৈরি হয়। বাহুল্যহীন শয্যা। সতরঞ্চি, চাদর, পাতলা এক টুকরো বালিশ। রাত্রে গায়ে দেবার কম্বল। সারা এপ্রিল রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে খাওয়া-দাওয়া শেষ। বৃদ্ধরা সোজা খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ে। জোয়ানরা ছেলে পড়ায়, সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম দেখে, কেউ একটু হেঁটে আসে। রাত দ্বিতীয় প্রহরে পা দিতে তারাও শয্যা নেয়। দশটা বাজতে সবাই নিদ্রিত। তখন বাতি জ্বলে কেবল বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতীয় বাড়িতে।

অনুশীলাদেরও, সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট সারা। গ্রীষ্মের দিল্লী শহরে সহজে সন্ধ্যা নামতে চায় না। সূর্য অস্ত গেলেও আলো

থাকে অনেকক্ষণ। বহু সাধ্যসাধনা করে লাজুক সন্ধ্যাকে ডেকে আনতে হয়। যখন সে আসে, ঘড়িতে আটটা বাজে। মাঠে ছেলেমেয়েদের খেলা শেষ হতে চায় না।

সুনৃত অনেক সময় বারান্দায় চেয়ার পেতে ছোটদের খেলা দেখে। দলবেঁধে খেলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা। দল তৈরি হবার দু'তিনটি সহজ নিয়ম আছে। প্রথম নিয়ম বয়স। সমবয়সী শিশুদের এক একটা দল। দ্বিতীয় নিয়ম, প্রকৃতি। ছেলে ও মেয়েরা আলাদা খেলে। তৃতীয়, ভাষা। শেষের নিয়ম শিবাজী স্কোয়ারে চলে না। এক এক ভাষার যথেষ্ট সংখ্যক ছেলেমেয়ে নেই বলেও বটে, শিশুদের কাছে ভাষার অবরোধ শক্ত নয় বলেও অনেকটা। পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ রোজ একত্রিত হয়। ঘরে ঘরে সংরক্ষিত বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিকতা প্রতিদিন সবুজ মাঠে নরম মাটিতে একটু একটু করে ক্ষয়ে যায়।

সুনৃত ছোটদের খেলা দেখে আর ভেবে মজা পায়। পঁচিশ ত্রিশটা পরিবারে ভারতবর্ষ রূপায়িত এই শিবাজী স্কোয়ারে। দেশ এক, কিন্তু মন প্রাণ ভাবনা চেতনা কত বিভিন্ন। এ-পরিবারগুলির মধ্যে আন্তরিক যোগসূত্র নেই। যেটুকু সংযোগ ও সংঘাত, কেবল বাইরের। দুটো বস্তু একই পথে চলতে গিয়ে গায়ে গা লেগে যায়। তার চেয়ে বেশি সংঘাত নেই। সবাই আছে নিজের গণ্ডির মধ্যে। তবু যেটুকু মেলামেশা তার পথ নির্দেশ করে ভাষা। তামিল সচরাচর যায় তামিলের কাছে, বাঙালি বাঙালির। পঞ্জাবি মেশে তার দেশ-ভাইদের সঙ্গে। এ সীমিত মেলামেশার প্রধান কারণ ভাষা। অন্য কারণও অবশ্য আছে—আমাদের সামগ্রিক আঞ্চলিকতা।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা তার ধার ধারে না। জীবনের দুরন্ত চাহিদা আঞ্চলিকতায় মেটে না। তারা ভাষার দেওয়ালে একে অন্য থেকে আলাদা নয়। হিন্দী-ইংরেজি-পাঞ্জাবি-তামিল-বাংলা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অপূর্ব ভাষা সৃষ্টি করে নেয়। সুনৃত দেখতে পায় আমাদের আঞ্চলিকতা পেছনে ফেলে দিল্লীর মাঠে মাঠে, স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যপঞ্চাশে নতুন সামগ্রিক ভারতীয় সত্তা গড়ে উঠেছে।

এদিক থেকে, সুনৃত মনে করে, দিল্লীর বিশেষ স্থান আছে ভারতবর্ষে। কলকাতার মত আন্তর্জাতিক শহর তো ভারতে আর নেই, কিন্তু কলকাতায় নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক তৈরি হচ্ছে না, হতে পারে না, যেমন পারে না জৌলুসি বোম্বাই-এ, শান্ত মাদ্রাজে। এরা সব আঞ্চলিক মহানগরী। কলকাতার লোকেরা যতোগুলি ভাষাই বলুক না কেন, শহরটা বাঙালি শহর, যেমন মাদ্রাজ তামিল, বোম্বাই মরাঠি, আমেদাবাদ গুজরাটি, অমৃতসর পাঞ্জাবি। ভারতবর্ষে একমাত্র ভারতীয় শহর দিল্লী, সবাকার শহর, কারুর একার নয়। যত ত্রুটিপূর্ণ হোক, যত নাক-উঁচু, বাস্তববিমুখ, আত্মপ্রসন্ন, অহমিকায় কর্কশ হোক, দিল্লীর মানস সচেষ্টভাবে ভারতীয়, দিল্লীর দৃষ্টিও। একমাত্র দিল্লী থেকেই ভারতবাসী গোটা দেশটাকে দেখতে চায়, দেখতে পায়। আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে চায়। কখনও পারে কখনও হারে। কিন্তু চেষ্টায় বিরত হয় না।

রাজধানী শহরের এই সর্বভারতীয় মানস ও দৃষ্টি যে প্রধানত প্রশাসনিক সুনৃত তা জানে। তাতে ক্ষতি নেই, অন্তত আরও কিছুদিন। প্রশাসন দেশে জনকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছে। তার মহিমা এখন বেড়ে চলবে। একদিন প্রশাসন থেকে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টি অন্য পথেও প্রসারিত হবে।

দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবনে সমগ্র ভারতের পরিচয় এখনও প্রস্ফুটিত নয়। এখানে ভাষার বাধা। এমন কোন ভারতীয় ভাষা নেই যার আবেদন সব ভারতীয়ের কাছে পেঁছয়। তাই নাটক, ছায়াচিত্র, সঙ্গীত প্রধানত আঞ্চলিক আনন্দ পরিবেশন করে। শিক্ষিত সমাজকে ইংরেজি এখনও একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে, কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই, গর্ব নেই, আনন্দ নেই। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় দৃষ্টির যে-দৃশ্যরূপ বৃহত্তর আবেদনে সক্ষম, সেই নৃত্য—তামিলের ভারতনাট্যম, মালাবারের কথাকলি, আসামের মণিপুরী পাঞ্জাবের ভাংড়া, বাংলা-উড়িষ্যা-বিহারের পল্লীনৃত্য—এ-সবের আবেদন এখনও সর্বজনীন। উদয়শংকর, ইন্দ্রাণী রহমান, রামকুমার সারা ভারতবর্ষে আদর পাবেন, কিন্তু কবি ও লেখকরা, নট ও নাট্যকার, আঞ্চলিক

সীমানায় অবরুদ্ধ। অমন যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকেই বা ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার কতটুকু অংশ ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছে ?

সুনৃত মাঠে ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েদের দেখে আর ভাবে, ওরা শৃঙ্খল ভাঙছে। পরাধীনতার পর ভারতবর্ষে সবচেয়ে শক্ত শৃঙ্খ ভাষা। এই মধ্যপঞ্চাশে ওরা সে শৃঙ্খল ভাঙছে :

ওরা আরও অনেক শৃঙ্খল ভাঙছে।

মিলি যেদিন দশ নম্বরের মাদ্রাজি মেয়েটিকে সই পাতিয়ে ঘরে নিয়ে এল, অনুশীলা খুশি না হয়ে পারল না। মেয়েটাকে বহুদিন সে কারুর সঙ্গে মিশতে দেয়নি। ভয় পেয়েছে। পাড়ার বেশির ভাগ পরিবার নিম্নবিত্ত। ছেলেমেয়েগুলি নোংরা আধময়লা জামা পরে, হাতে-পায়ে বড় বড় নখ, চুলে বুঝি উকুন। ওদের সঙ্গে মিশলে মিলির অসুখ করবে, স্বভাব নোংরা হবে, কুৎসিত সব কথাবার্তা শিখবে। সুনৃত অনেকবার সাবধান করেছে—মেয়েটাকে ঘরকুনো করে রেখো না, পস্তাবে ; অনুশীলা মনে মনে মানলেও মেয়েকে ছাড়তে পারে নি। তারপর অবশ্য মিলিই একদিন বাঁধন কেটে বেরিয়ে গেছে। অনুশীলা বিকেলে স্নানের ঘরে ঢুকেছে, মিলি চেয়ারে উঠে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে অর্জুন গাছের তলায় ছেলে-মেয়েদের ভিড়ে জমে গেছে। অনুশীলা তাকে জোর করে ডেকে আনতে গিয়েও সব সময় সফল হয়নি। শেষে একদিন আর চেষ্টাও করে নি। মিলিও শৃঙ্খল কেটেছে।

যে-মেয়েটিকে মিলি নিয়ে এল তার নাম উমা। উমা সুব্রহ্মনিয়ম। তার বাবাকে সুনৃত মাঝেমধ্যে দেখেছে, কথা হয় নি ; মাকে অনুশীলা আজ পর্যন্ত দেখে নি। মিলির চেয়ে বছর দুই বড়, শ্যামা, ছোট ছোট চকচকে চোখ। নাকে সোনার নথ, হাতে দু'গাছি বালা, গলায় পুঁতির হার। লাল পেটিকোট আর নীল ব্লাউজে রঙিন। চুল অগোছালো, লালচে ; দাঁত খুব সাফ নয়, তবু অনুশীলা তাকে দেখে খুশি হল। মিলির সে প্রথম স্বোপার্জিত সখী।

উমা সুব্রহ্মনিয়মের পথ ধরে কয়েকদিনের মধ্যে অনুশীলার ঘরে এসে জুটল রাজ আহুজা, দীপা সান্যাল, সরোজ কাপুর,

লক্ষ্মী বালকৃষ্ণম, প্রেম চাড্ডা, মায়া চাঁদ। সব মিলির সহেলী। তাদের যাওয়া-আসার সময় নেই, অনুশীলার অনুশাসন অচল। তারা সকালে খেলে, দুপুরে খেলে, বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলে। অনুশীলার বেশ লাগে মেয়েগুলোকে। রাজ আহুজা মোটা-সোটা কালো, মাথায় একঝাঁক কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখে চঞ্চল সজীবতা। কেরানি বাপের সপ্তম সন্তান, দুটোর বেশি ফ্রক নেই, একটা ছেঁড়া। দীপা সান্যাল রোগা, হাড়-বার-করা ফ্যাকাসে, মুখখানা আশ্চর্য করুণ। হাসলে দু'গালে টোল পড়ে। বাবা সরকারি দপ্তরে সেকশন অফিসার অর্থাৎ বড়বাবু। সরোজ কাপুর ধবধবে ফর্সা। লাল টুকটুকে ঠোঁট, রুক্ষ লাল চুল, সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখলে মেম-সাহেবের মেয়ে মনে হত। সস্তা ছিটের সালোয়ার, সাটিনের কামিজেও তাকে বড় সুন্দর দেখায়। বাড়িতে সৎ-মা, অনুশীলার সন্দেহ, সে পেটভরে খেতে পায় না। লক্ষ্মী বালকৃষ্ণম তাম্রবর্ণ, পাঁচ বছরের তুলনায় বড্ড ছোট দেখতে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দাঁতে পোকা ধরেছে, হাতের নখগুলি বড় বড়। আস্তে আস্তে কথা বলে, ফোগ্‌লা দাঁত বার করে কেবল হাসে। দু'বোন, এক ভাই। বাবা কিছুদিন হল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে প্রমোশন পেয়েছে। প্রেম চাড্ডার একখানা পা খোঁড়া। টাইফয়েড জ্বরের পরিণাম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, মুখখানা বিষণ্ণ। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মিলির নিকটতম প্রতিবেশী। মায়া চাঁদ ত্রিলোকচাঁদের কন্যা।

সুনৃতের ভাবতে ভাল লাগে, মজা লাগে, মিলি গোটা ভারতবর্ষকে তার গৃহে ডেকে এনেছে। ভাষা এই শিশু-ভারতীকে বিচ্ছিন্ন করে নি। সংস্কার, নিষেধ, সংকীর্ণতা, আলাদা করে নি। অনুশীলা যে সাদরে ওদের গ্রহণ করেছে তাতেও সুনৃত কম আনন্দ পায় নি। ভেতরের উঠোনে বা স্বল্পপরিসর বারান্দায় ওরা খেলা করে, অনুশীলা বড় একটা কাছে ঘেঁসে না; কিন্তু ওদের কথাবার্তায় চালচলনে তার চোখ-কান যে সতর্ক, সুনৃত তা বুঝতে পারে সন্ধেবেলা বা রাত্রে মেয়েদের সব মজার গল্প শুনে। অনুশীলার এ-পাড়ায় এসে একা লাগছিল, এবার তা অনেকটা দূর হয়েছে।

"সুবিধে হল", অনুশীলা হাসতে হাসতে বলে, "সুবিধে হল,

মেয়েরা ঝগড়া করে, আড়ি দেয়, রাগ করে, কিন্তু মারামারি বড় একটা করে না। খুব বেশি হলে একটু খিমচে দিল, চুল ধরে টানল, চড়-চাপড় লাগাল। গুরুতর কিছু হবার আগেই কেঁদে ফেলে। তা নইলে মিলির খেলার আসর কবে ভেঙে যেতো।"

"অর্থাৎ মেয়েদের ঝগড়া মায়েদের লড়তে হত ?"

"তা নয়তো কি ? সেদিন বিকেলে দুটো ছেলেয় মারামারি হল। দুটোই পাঞ্জাবি, একটা বোধহয় ত্রিশ নম্বরের অন্যটা কত নম্বরের জানি নে। সন্ধেবেলা দু' বাপে হাতাহাতি হবার জোগাড়।

"দু' মায়ে নয় কেন ?"

"তারাও নিশ্চয় হাতাহাতি করেছিল, ভরসা কি ?"

"হাত দিয়ে না হলেও হাতা দিয়ে। কি বল ?"

"মেয়েগুলো যে এক আধটু ঝগড়া করে তা নিয়েও ওদের মায়েদের মাথাব্যথা। সেদিন সান্যাল গিন্নী এসে উপস্থিত। আগে আসেন নি কোনদিন, আমি তো বেশ আদিখ্যেতা করে বসতে দিলাম। বসেই তিনি নালিশ তুললেন। দীপাকে প্রেম মারল কেন। গালে দাগ হয়ে গেছে, এ-দাগ যদি না সারে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না ? আমি বলতে গেলাম, দাগ কোথায়, একটু আঁচড়ে গেছে, ডেটল তো আমিই লাগিয়ে দিয়েছি, আজই সেরে যাবে। তিনি আরও চটে গেলেন। সারলেই হল ! প্রেমের বাবা আর সান্যাল মশাই নাকি একই আপিসে কাজ করেন। সান্যাল মশাই ওপরে, চাড্ডা নিচে। ওর বাবা আমার কর্তার কতো নীচে কাজ করে, জানেন ? নিশ্চয় গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে মেয়েটাকে শিখিয়ে দিয়েছে দীপার মুখে দাগ করে দিতে। নিজে তো খোঁড়া, এবার আমার মেয়েটাকে বিকলাঙ্গ করার মতলব !"

শুনে সুনৃত হেসে অস্থির।

"একটা গল্প চালু আছে কালীবাড়িতে, বলছি শোন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন সবে মন্ত্রী হয়ে এসেছেন। তাঁর মার কালীবাড়ির ওপর খুব ঝোঁক। প্রায় রোজই সন্ধেবেলা আসেন। প্রথম দিন তাঁকে গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে, তিনি কালী-মন্দিরের দরজায় ডান পাশে বসে আছেন। এমন সময় তোমার ঐ সান্যাল গিন্নী

সেখানে উপস্থিত। যে-স্থানটিতে তিনি মাঝেমধ্যে উপবিষ্ট হন, সেখানে অন্য একজনকে সমাসীন দেখে সান্যাল-গিন্নী চটলেন।

'কে গো বাছা আপনি, আমার জায়গাটি বেশ দখল করে নিয়েছেন?' সান্যাল-গিন্নীর সম্ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ-জননী চমকিত হলেন।

'এটা বুঝি আপনার জায়গা? তা বসুন না, আমি সরে যাচ্ছি।'

'সরে গেলেই হল? আজ পাঁচ বছর ধরে আমি এখানটিতে এসে সন্ধেবেলা একটু মার চরণতলে বসি, সারা দিল্লী শহরে তা কে না জানে?'

'আমি নতুন এসেছি কিনা, তাই বুঝতে পারিনি।'

'অ, নতুন এয়েছ? তা, ছেলের কাছে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। ছেলের বৌ দেখাশোনা করে? ভাত রেঁধে দেয়? হুঁ। চুপ করে যখন আছ তখন বুঝেছি। কোন্ শাশুড়ীকে ছেলের বৌ আর ভাত রেঁধে খাওয়ায়? তা, ছেলে তোমার কোন্ দপ্তরে কাজ করে?'

'তা তো বলতে পারি নে।'

'অ। কি টাইপ বাড়িতে থাকে?'

'তা তো জানি নে।'

'গোল মার্কেটে তো? নাম কি ছেলের? আমি এখুনি বলে দিচ্ছি।'

'না, গোল মার্কেটে নয়। নিউ দিল্লীতে।'

'আ মলো যা। গোল মার্কেট বুঝি নিউ দিল্লীর বাইরে? একেবারে নতুন এয়েছ। কিচ্ছু জানো না দেখছি।'

'এই তো এসেছি সপ্তাহ খানেক।'

'তা বাছা, কালীবাড়ি আসবে বৈ কি? এই হল বাঙালির তীর্থস্থান! মা'র কাছে দু'দন্ড বসলে প্রাণ জুড়োয়। তবে বাছা, আমার জায়গাটি দখল করে নিও না। তা আমি সইব না। আমার কর্তা সেক্শন অফিসার, কেরানি নন।'

অনুশীলা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

"কক্ষনো নয়। এ গল্প মিথ্যে।"

"দাঁড়াও না। আরো আছে। বাড়ি ফিরে শ্যামাপ্রসাদ-জননী ছেলেকে প্রশ্ন করলেন ঃ

'হ্যাঁ রে, তুই কোন্ দপ্তরে কাজ করিস ?'

'কেন, মা ?'

'কি-টাইপ বাড়িতে থাকিস ?'

'জানি না তো।'

'তুই কি সেক্‌শন অফিসারের নীচে, না ওপরে ?'

শ্যামাপ্রসাদ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, ব্যাপারখানা কি ! মার কাছে শুনে হেসে ফেটে পড়লেন।"

অনুশীলা বলে উঠল, "ওরে বাবা, আর হাসতে পারছি না। এ গল্প কখনো সত্যি নয়।"

"অস্থির হচ্ছ কেন ?" সুনৃত বলল। "আরো আছে।"

"এর পরেও ?"

"দুদিনের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল সান্যাল-গিন্নী—শ্যামাপ্রসাদ-জননীর ঘটনা। শুনতে পেয়ে সানাল মশাই ছুটে এলেন কালীবাড়ি। তাঁর এমন দুর্ভাগ্য যে তিনি শ্যামাপ্রসাদের দপ্তরেই একজন সেকশন অফিসর।

"কি সর্বনাশ !"

"জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর চক্ষুস্থির। এখন কি উপায় ! সন্ধেবেলা গিন্নীকে নিয়ে কালীবাড়ি বসে রইলেন। শ্যামাপ্রসাদ-জননী এলে—"

"থাক, থাক, আর বলতে হবে না। এজন্যেই তুমি লেখক হলে না। অমন সুন্দর গল্পটাকে নষ্ট করতে আছে ? এ কি তোমাদের বাড়িঘর তৈরি, যে কাজ আর ফুরোয় না !"

"গল্প বুঝি ধপ করে থেমে যায় ?"

"অন্তত কোথায় থামতে হবে লেখকদের তা জানা উচিত। না জানলে গল্প নষ্ট।"

"আচ্ছা না হয় তাই। এখন বলো, গল্পটা কেমন ?"

"চমৎকার ও আগাগোড়া বানানো।"

"তবু সত্যি। যা ঘটে তাই শুধু সত্যি নয়। যা ঘটতে পারতো

তাও সত্যি।"

"আমাদের সান্যাল-গিন্নীর নাম উঠল কেন?"

"ওটা আমি দিলাম। টাইপ তো একই।"

রতনলাল চাড্ডার সঙ্গে সুনৃতের আলাপ হয় নি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এ-মানুষটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কথা বলে আশ্চর্য কম। যেমন নিজে নীরব তেমনি তার স্ত্রী। বাড়িতে বুড়ো বাপ মৃত্যুর দরজায় দীর্ঘকাল অবস্থান করছে। সমস্ত রাত সে কাশে। তিনটি সন্তান, বড়ো মেয়ে প্রেম খোঁড়া। তারপরে আর একটা মেয়ে; ছেলেটা এখনও কোলের। চাড্ডার সংসারে কেমন চাপা নিরানন্দ। পোশাকে চাড্ডা শৌখিন পুরুষ, কিন্তু গৃহে বিষণ্ণ। তার স্ত্রী নির্জীব, ফ্যাকাশে। সুনৃত তাকে দেখেছে যেতে আসতে, কখনও সে চোখ তুলে তাকায় নি! যেন এড়াতে চেয়েছে। সুনৃতের মনে হয়েছে, জীবনের ক্ষুদ্রতম গুহায় সে বুঝি লুকিয়ে আছে। ধরা পড়বার ভয়ে সদা-শংকিত।

এই রতনলাল চাড্ডাই এসে একদিন সকালে সুনৃতের দরজায় দাঁড়াল।

সুনৃত দরজা খুলে বলল, "আসুন, বসুন এসে।"

"না, না, মিঃ মুখার্জি।" রতনলাল চাড্ডা যেন পালাতে পারলে বাঁচে। "বসবো না। একটা অনুরোধ করতে এলাম।"

"বলুন।"

"আমি কাল একটু বাইরে যাচ্ছি। বড় দরকার তাই যেতে হচ্ছে। আমার বাবার অবস্থা তো দেখছেন। একটু নজর রাখবেন।"

"নিশ্চয় রাখবো। কবে ফিরবেন?"

"যত তাড়াতাড়ি পারি।"

"ওঁর অবস্থা কেমন?"

"খুব খারাপ। এখন গেলেই ভাল। উনিও রক্ষা পান, আমিও।"

"আয়ু ফুরোলে তো যাবেন।"

"আচ্ছা, নমস্তে। বড় কৃতজ্ঞ হলাম।"

"কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরবেন।"

সুনৃত-অনুশীলা বৃদ্ধ প্রতিবেশীর খোঁজ রাখল। চাড্ডার অনুপস্থিতিতে সুনৃত বড় একটা ভেতরে যায় নি, সকালে একবার দেখে এসেছে ; অনুশীলা দিনেরাত্রে তিন-চারবার খোঁজ নিয়েছে। এই সূত্রে চাড্ডা-গৃহিণীর সঙ্গেও তার আলাপ হল। স্বল্পভাষিণী ক্লান্ত, নিস্তেজ মহিলা, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কলের মত কাজ করে যায়। অনুশীলা তার মুখে কখনও এক ঝিলিক হাসি দেখে নি। মনে হয়েছে রক্তহীন দুটি সাদা সাদা বড় চোখে ভয় পুঞ্জীভূত বরফ হয়ে আছে। সে ভার সে বইতে পারছে না। কোন গাল-গল্পে অনুশীলা তাকে টানতে পারে নি। যখনই গেছে, সে কাজে ব্যস্ত। প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছে। উল্টে কিছু জিজ্ঞেস করে নি। জীবনে তার কৌতূহল যেন সমাপ্ত! ছেলেমেয়েদের কখনও একটা কটু কথা সে বলে না। মুমূর্ষু বৃদ্ধকে যন্ত্রের মত সেবা করে। তার রাগ নেই। সে বিরাগ।

মেয়েটির নাম কমলা। অনুশীলার ধারণা ত্রিশের বেশি তার বয়স নয়।

পাঁচ দিন হয়ে গেল তবু রতনলাল চাড্ডা ফিরে এল না। এদিকে বৃদ্ধের শেষ সময় উপস্থিত।

ভোরবেলা অনুশীলা বিছানায়, সুনৃত সবে দুধ নিয়ে ফিরেছে। দরজায় ধাক্কা পড়ল।

সুনৃত দরজা খুলে দেখতে পেল পাশের বাড়ির বৌ।

অনুশীলাকে ডেকে দিল।

অনুশীলা এসে কাছে দাঁড়াতে কমলা চাড্ডা আস্তে বলল, "উনি মারা গেছেন।"

অনুশীলার বুক কেঁপে উঠল। জীবনে মৃত্যুর এত কাছাকাছি সে এই প্রথম।

"কখন ?"

"কাল রাত্রে।"

"ক'টার সময় ?"

"তিনটে পঁচিশ।"

"আমাকে ডাকেন নি কেন ?"

"অত রাত্রে—"

সুনৃত সব শুনতে পেয়েছিল। কাছে এসে প্রশ্ন করল ঃ

"মিঃ চাড্ডা আসেন নি ?"

"না।"

'আর কাউকে খবর দিয়েছেন।"

"না।"

বিপদে পড়ল সুনৃত। এ কাজ তাকেই করতে হবে।

"আচ্ছা, আমি সবাইকে ডাকছি।"

"চা খেয়ে যাও", অনুশীলা বলল।

"তুমি চা করো, আমি আসছি।"

"একটা কথা আছে।" কমলা চাড্ডা হঠাৎ পরিষ্কার জোর গলায় বলল। এত জোরের সঙ্গে তাকে কথা বলতে অনুশীলা কখনও শোনে নি।

"বলুন

"আমার কাছে টাকা নেই।"

"সে কি ?"

"কাল আমরা খাই নি। যা টাকা দিয়েছিল সব ফুরিয়ে গেছে।"

সুনৃত-অনুশীলা বিপদে পড়ল, বিরক্ত হল।

"তাহলে কাজকর্ম হবে কি করে ?"

"এইটে নিন।"

হাতে একগাছা বালা ছিল। অনুশীলার দিকে এগিয়ে দিল।

অনুশীলা এক পা সরে গেল।

সুনৃত প্রশ্ন করল ঃ "চাড্ডা কবে আসবে ?"

"জানি নে।"

"কোথায় গেছে ?"

"বলে যায় নি।"

অবাক কাণ্ড! রহস্যময় ব্যাপার! কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল সুনৃত!

কর্কশ কণ্ঠে বলল ঃ "আসবে তো ?"

"জানি নে।"

অনুশীলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা লোকজন ডাকুন। একটু বেলা হলে আমি নিজেই বালা বেচে টাকা এনে দেব। টাকার জন্যে আটকাবে না। শুধু দেখবেন, আমরা গরিব, খরচ যত কম হয় তত ভাল।"

সুনৃত পাড়ার অনেককে খবর দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিড় জমল চাড্ডা-ভবনে। অনুশীলাও গেল। খোঁড়া মেয়েটা ঘরের সব কাজকর্ম করছে। ছোট ভাইকে সামলাচ্ছে। ছোট বোনটা বারান্দায় বসে কাঁদছে, বোধহয় ক্ষিদেয়। নোংরা স্যাঁতসেতে বিছানায় হাড়-বার-করা শীর্ণ বৃদ্ধ দেহ এক টুকরো শুকনো কাঠের মত পড়ে আছে। দেখলে মনে হয় না এদেহে কোনও দিন প্রাণ ছিল।

মেয়ে দুটোকে অনুশীলা িজের ঘরে নিয়ে এল। খেতে দেবে। কোলের ছেলেটা কিছুতেই মার কাছ ছাড়ল না। তাকে কোলে নিতেও অনুশীলার তেমন প্রবৃত্তি হল না।

সকলে যখন একত্র হয়েছে, সুনৃত অর্থ-সমস্যার কথাটা পাড়ল। ঠিক কাউকে নয়, সবাইকে উদ্দেশ করে সে অবস্থা বুঝিয়ে দিল। সবাই যেন অবাক, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল হঠাৎ।

সুনৃত বলল, "এ-কাজ আমাদেরই করতে হবে। যা খরচ লাগে সবাই মিলে আসুন দিয়ে দি।"

দীপংকর সান্যাল বলে উঠলেন. "চাড্ডা যদি না আসে, তার পরিবারের ভারও কি আমাদের সবাইকে নিতে হবে?"

"আসবে না কেন?" সুনৃত প্রতিবাদ করলো। "কোথাও হয়তো আটকে গেছে। দু-এক দিনেই আসবে। আমি তাকে বলে দিয়েছি তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"তাইতো ফিরছে!" সান্যাল তেতো বিদ্রূপ করে উঠলেন। আহুজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কলকাতায় হিন্দু সৎকার সমিতি আছে। আপনাদের অমন কিছু নেই? টেলিফোন করে দিলেই ব্যস।"

কমলা পাশের ঘর থেকে সোজা সবার সামনে চলে এল।

বলল, "এই বালাটা নিন। বিক্রি করে সব কাজ করুন। নয়তো

একটু বেলা হোক, আমিই বিক্রি করে টাকা এনে দেব।"

দরজায় কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুনৃত তাকে চেনে। সিন্ধী মেয়ে! পাশের বাড়ির অমৃত মিরচান্দানি। সে এগিয়ে এল।

বলল, "বালা রেখে দাও। কাজে লাগবে।" পুরুষদের সম্বোধন করে বলল, "আমি টাকা দিচ্ছি। আপনারা ব্যবস্থা করুন।"

বলে, সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। দু মিনিট পরে এসেই সুনৃতের হাতে একশ' টাকার নোট দিয়ে বলল, "এই নিন। এতে সব হয়ে যাবে।"

মৃত্যুর মতই নিঃসাড় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল ঘরখানাতে। সুনৃতের মনে হল মরে-কাঠ বুড়োর রক্তহীন মুখে ভৌতিক হাসি ফুটে উঠেছে।

সুনৃত আহুজার হাতে নোটখানা দিয়ে বলল, "যাক। সমস্যা চুকে গেল। আমি তো জানি না কি কি করা দরকার। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।"

আহুজা নিজের বাসায় গিয়ে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির লিস্ট তৈরি হল। মিরচান্দানি, আহুজা, সর্দার মোহন সিং ও আরও দুজন পাঞ্জাবি শ্মশানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আহুজা সুনৃতকে বললেন, "আপনি অফিস যান। আমরাই যা করার করে আসবো।"

সুনৃত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আহুজা বললেন, "এ জিনিসগুলি আনতে হবে। কাউকে পাওয়া যায়?"

সন্তোষ এতক্ষণ নীরবে মাথা নিচু করে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে বলল, "আমায় দিন।"

আহুজা অবাক হলেন। "তুমি পারবে?"

"পারবো।"

এমন সহজভাবে সন্তোষ কথা বলল, আহুজা আর চিন্তা না করেই তার হাতে ফর্দ ও টাকা তুলে দিলেন।

"দেখো। সাবধানে কিনো। টাকা বুঝে নিও।"

নীরবে দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে গিয়ে সন্তোষ মিরচান্দানি থমকে

দাঁড়াল। বারান্দায় তারই দিকে অনিমেষ-নয়নে তাকিয়ে আছে তারা।

সন্তোষ চোখে চোখ রাখল। একটা অব্যক্ত ব্যথা বুক ভেদ করে তার ঠোঁটে এসে জমে গেল! কেঁপে উঠল ঠোঁট। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল।

তারপর তীরের বেগে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন দুপুরবেলা কমলা এল অনুশীলার কাছে। একদিনে সে আরও ফ্যাকাশে, আরও ক্লান্ত। জীবন থেকে তাকে মনে হচ্ছে আরও অপসৃত। অনুশীলার বুঝতে দেরি হল না, শ্বশুরের মৃত্যুর চেয়ে স্বামীর অন্তর্ধানই কমলাকে কাহিল করেছে বেশি। দু'চারটে সাধারণ কথার পর দুজনে নীরবে বসে রইল। কমলার বিষণ্ন নীরবতা অনুশীলাকে পীড়া দিতে লাগল।

এক সময় কমলা বলে উঠল, "আমার কিছু গহনা বিক্রি করতে হবে। আপনি নেবেন?"

"কেন? গহনা বেচবেন কেন?" ব্যথায় কাতর হল অনুশীলা।

"বেচতে হবে। ভাল, ভারী গহনা। আপনি নেবেন?"

"দোকানে দেওয়াই কি ভাল নয়?"

"বোধহয় তাই ভাল। তাই করবো। অমৃতকে নিয়ে যেতে হবে।"

"আপনার স্বামী রাগ করবেন না?

"না।"

"উনি কবে আসছেন?"

"উনি আর আসবেন না।"

অনুশীলা ব্লাউজের গলায় প্যাটার্ন তুলছিল। হাতে সূঁচ ফুটে গেল।

"সে কি? না, না। তা কি হয়?"

"উনি চলে গেছেন।"

"না, না। তা হতে পারে না।"

কমলা এমন নির্জীব মৃত চোখে অনুশীলার দিকে তাকাল,

অনুশীলার প্রতিবাদ জমে বরফ হল।

"তাই তো হল।"

"কেন হল ?" অনুশীলার মুখে কথা পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে।

"হবার ছিল, তাই হল।"

কাছাকাছি বসে আছে কমলা, অনুশীলা। দুজনের মাঝখানে একজনের নীরব যন্ত্রণা দেওয়াল হল। অনুশীলা কমলাকে যেন পেল না।

অনেকক্ষণ এভাবে কাটল।

তারপর এক সময় দেওয়াল ভেদ করে কমলা আবার কথা বলল। অনুশীলা তার ক্ষীণ কণ্ঠের শুকনো শব্দ শুনতে পেল ঃ

"পার্টিশনের সময় আমরা ছিলাম রাওয়ালপিণ্ডিতে। আমার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে।"

অনুশীলা চেয়ে রইল তার মুখে।

"পালিয়ে আসবার সময় আমাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে যায়।"

"বলেন কি ?"

"শ্বশুর ও উনি চলে আসেন হিন্দুস্থানে।"

"আপনাকে ফেলে ?"

"উপায় ছিল না।"

"তারপর ?"

"তিন বছর পরে শ্বশুরের চেষ্টায় আমাকে উদ্ধার করা হয়।"

অনুশীলার মাথা ঘুরে উঠল।

"স্বামী নিতে চান নি। শ্বশুর জোর করে নেওয়ালেন। বড় ভালবাসতেন আমায়। আমার বাবা ওঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন। নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেন আমায়।"

অনুশীলার চোখে পলক পড়ল না।

"স্বামী নিলেন বটে, কিন্তু একদিনও শান্তি পেলেন না।"

"আপনি ?"

"আমার কথা ছাড়ুন।"

"উনি মানতে পারলেন না ?"

"না। এমনিতে চুপচাপ মানুষ, মুখে কিছু বলতেন না। বাপের

সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন।"

অনুশীলা ভয় পেল, তারও বুঝি কথা বন্ধ হয়ে আসছে।

"তবু বাপ ছিলেন, তাঁকে মানতেন, তাই কেটে যাচ্ছিল।"

"খুব মানতেন বুঝি ?"

"না মেনে উপায় ছিল না। আমার শ্বশুর কড়া লোক ছিলেন। দশজনে মানতো তাঁকে।"

অনুশীলা চুপ করে রইল।

"বাপ মরে গেলে আর আমাদের একসঙ্গে থাকা হত না।"

"তাই উনি চলে গেলেন ?"

"আমিই পাঠিয়ে দিলাম।"

"আপনি নিজে ?"

"আমি নিজেই।"

"কোথায় গেলেন ?"

"কোথাও যান নি। এখানে, দিল্লীতেই আছেন।"

"কোথায় ?"

"তা তো জানি নে।"

"জানলেন কি করে ?"

"আন্দাজ করছি। যাবার স্থান নেই।"

"আপিসে খবর নিয়েছেন ?"

"দরকার নেই।"

"সবাই তো জেনে ফেলবে।"

"জানবেই তো।"

"আপনার চলবে কি করে ? তিনটে ছেলেমেয়ে !"

"চলে যাবে। আপাতত কিছু টাকা চাই।"

"কেন ?"

"শ্বশুরের কিছু ধার আছে। শোধ দিতে হবে।"

"উনি দেবেন না ?"

"মনে হয় না।" একটু থেমে, "শ্বশুরের মত আপনার জন আমার আর কেউ ছিল না। বাপের বাড়ির লোকেরা—বাবা, মা পর্যন্ত—আমাকে ফিরিয়ে আনবার বিপক্ষে ছিলেন। আমার খোঁজ

পাবার পর উনি নিজে গিয়ে আমাকে নরক থেকে ফিরিয়ে আনেন। এজন্যে সমাজে অনেক নির্যাতন ওঁকে পেতে হয়েছে। ছেলের জীবন বরবাদ করছেন জেনেও আমায় ঘরে নিয়ে এসেছেন।"

এতক্ষণে কামলা কাঁদল। স্বামীর জন্য নয়, শ্বশুরের শোকে।

উড়নীর আঁচলে চোখ মুছে বলল, "উনি, আমার স্বামী, লোক খারাপ নন। একটা ব্যবস্থা হয়তো করবেন ; অন্তত ছেলেমেয়েদের।"

"আপনার ?"

"আমি নিজেই কিছু একটা করে নেব।"

"কি করবেন ?"

"অমৃতকে বলেছি। একটা কাজ জোগাড় করতে হবে।"

"কাজ ? কি রকম কাজ ?"

"এক সময়, অনেকদিন আগে, ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম।"

"অমৃত পারবে জোগাড় করতে ?"

"বলছে তো পারবে।"

"মেয়েটা বেশ পরোপকারী আছে।" অনুশীলা অনেকটা নিজের মনে বলল।

"খুব।"

"ছেলেমেয়েরা কই ?"

"ওদের বাড়িতে।"

"আপনি কিছু খেয়েছেন ?"

"খেয়েছি।"

রাত্রে সব শুনে সুনৃত বলল, "এখানেই ওরা বড়। বাঁচবেই, কেননা বাঁচতেই হবে। তাই ওরা মরে না, মার খায় না। ওরা মার্ডার করে, সুইসাইড করে না।"

অনুশীলা বলল, "বেঁচে থাকা যে এত কঠিন, কখনও ভাবিনি।"

"সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবন বদলাচ্ছে আমাদের দেশেও," সুনৃত বুঝিয়ে দিল। "কতো নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই সাবেকী মাপকাঠির বিচার আর চলছে না। তবু তো এখনও মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি আমরা, বোমায় মরিনি, যুদ্ধে যেতে বাধ্য হইনি।

য়ুরোপের দেশগুলির মত একটা বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক ভারতবর্ষ দেখবে জীবন কি ভীষণ ঘুরপাক খেয়ে যায়।"

"দরকার নেই ঘুরপাকে।" একটু অন্যমনস্ক হয়ে অনুশীলা বলল, "সিন্ধী মেয়েটার গুণও আছে।"

"আছে বৈ কি! কেমন এগিয়ে এসে টাকা বার করে দিল। আবার চাড্ডার বৌকে চাকরিও পাইয়ে দেবে।"

"মানুষকে বিচার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা।"

"বিচার কোরো না।"

"তা না হয় না করলাম। কিন্তু তুমি সিন্ধুতীরবাসিনীকে নিয়ে অত উৎসাহিত হ'য়ো না।"

সপ্তাহখানেক পরে সন্ধেবেলা সুনৃত-অনুশীলা বেড়িয়ে ফিরবার সময় সুব্রহ্মনিয়ম-গৃহের সামনে তিনখানা গাড়ি দেখে বিস্মিত হল। নিয়ন বাতি জ্বলছে বসবার ঘরে। বেশ কিছু মানুষের সমাবেশ। শতরঞ্চি বিছানো হয়েছে সারা বারান্দায়, তাতেও লোকের ভিড়।

"তামিল ভবনে উৎসব মনে হচ্ছে," সুনৃত বলল।

"উৎসব নয়, সভা।"

"তুমি আজকাল পাড়ার গেজেট হয়ে দাঁড়িয়েছ। কিসের সভা?"

"তামিল-সঙ্ঘের।"

"এ-বাড়িতে কেন?"

"সুব্রহ্মনিয়ম সঙ্ঘের সেক্রেটারি।"

"তোমার সংবাদ বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রাপ্ত?"

"নিশ্চয়।"

"আহা, অনু। তোমার জন্যে দুঃখ হচে।"

"কেন? দুঃখের কি হল?"

"তোমার গৃহদ্বারে আজ পর্যন্ত গাড়ি এসে দাঁড়াল না।"

"করোলবাগে দাঁড়াত!"

"সে অতীত। আমি বর্তমানের কথা বলছি।"

"না দাঁড়াক। যে-পাড়ায় এনে ফেলেছ, এখানে বড়ো মানুষেরা আসবেন কেন?"

"ঐ তো এসেছেন।"

"গাড়ি থাকলেই বড় মানুষ হয় না। হয়তো কনট্রাক্টর—"

"ভুল। এ পঞ্জাবী নয়। এ হল তামিল। প্রত্যেকটি নয়া পয়সার কড়া হিসেব। সহজে এরা গাড়ি কেনে না। তামিল সমাজে গাড়ি মানে উচ্চপদ; আর মধ্যপঞ্চাশের ভারতবর্ষে উচ্চপদ মানে বড় মানুষ।"

সুনৃতের রসিকতা অনুশীলার মনের দুর্বল স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত করল। পুরুষগুলো বড় অকারণ নিষ্ঠুর। অনুশীলার মামীমা দিল্লীর উচ্চপদ রাজপুরুষের স্ত্রী। মামা-বাড়ির সঙ্গে অনুশীলাদের ছোটবেলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। দিল্লী প্রবাসে বড় মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুশীলাকে শ্লাঘা ও আত্মতুষ্টি দিয়েছিল। বলতে ভাল লাগে বৈকি, এ. কে. লাহিড়ি আমার মামা।

এ. কে. লাহিড়ি ও তাঁর পত্নী শিখা লাহিড়ি দিল্লীতে সুপরিচিত। কেউ বলবে না, কোন্ এ. কে. লাহিড়ি। শুধু বলবে, তাই নাকি? আপনার মামা? বলবে, আর তক্ষুনি বেশ খাতির, খানিকটা সমীহ করবে।

লাহিড়িদের সমাজ আলাদা, জীবন কর্মব্যস্ত। সম্পর্ক সুনৃত-অনুশীলাকেই উদ্যোগ-উৎসাহে টাটকা রাখতে হয়। মাঝে মধ্যে ওরা যায় লাহিড়ি বাংলোয়। যাবার আগে ফোন করে নেয়। কখন সখন শিখা লাহিড়ি টেলিফোনে সুনৃতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অনুশীলা অনেকবার বলেছে, "মামী, তোমরা একবার আমাদের এ-বাসায় এসো।" মামী করোলবাগের বাসায় একবার এসেও ছিলেন।

শিবাজী স্কোয়ারের বাসা নেওয়ার সময় অনুশীলা ভয় পেয়েছিল, মামী এখানে আসবেন না।

আসেনও নি।

অভিমান করে মাসখানেক অনুশীলা মামাবাড়ি যায় নি। এক-সময় সুনৃত টেলিফোন পেল শিখা লাহিড়ির কাছ থেকে।

"তোমাদের খবর কি?"

"ভাল"।

"অনু ভাল আছে তো ? মিলি ?"

"ভালই আছে।"

"অনেকদিন তো আসো নি তোমরা।"

"হয়ে ওঠে নি।"

"রবিবার এসো। রাত্রিতে খেয়ে যেয়ো। অনুকে মিলিকে নিয়ে এসো।"

"কিছু ফাংশন আছে নাকি ?"

"না, না। তেমন কিছু নয়। বিবির জন্মদিন। এসো কিন্তু।"

"আসবো।"

মামী খোঁজখবর রাখেন। রবিবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি বেড়ে গিয়েছিল। মামী সোফারকে ডেকে বলে দিলেন, "মুখার্জি সা'বদের পেঁৗছে দিয়ে এসো।"

সুনৃত আপত্তি করল, "না, না। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।"

"দরকার কি ? গুলাব সিং পেঁৗছে দিক।"

"কোন প্রয়োজন নেই, মামীমা," সুনৃত সামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। "আপনি বরং ট্যাক্সির জন্যে ফোন করে দিন।"

মামী তাই করেছিলেন।

অনুশীলা এবার কথাটা তুলেছিল !

"তোমরা তো একদিনও এসে দেখে গেলে না কেমন আছি, কোথায় আছি !"

"একেবারে সময় পাইনে, অনু". শিখা লাহিড়ি মুখখানিকে বেজার করে জবাব দিয়েছিলেন. "কি করে যে দিন কাটে টের পাইনে।

"অবশ্যি এমন পাড়ায় থাকি যে তোমাকে যেতেও বলতে পারিনে," অনুশীলা অভিমান করেছিল।

"ছি. ছি। ও আবার কি কথা !" শিখা লাহিড়ি প্রতিবাদ করেছিলেন, "আজকাল আবার ওসব স্নবারি আছে নাকি ? অন্তত আমার নেই। যে-বাড়ি প্রাপ্য তা কি পাওয়া যায় আজকাল ? দেখ্ না, আমরা এ-বাংলোয় আছি, এটা আমাদের একধাপ নীচে। এখন আমাদের আওরংজেব রোড বা কিং এডোয়ার্ড রোডে বাংলো

পাবার কথা। এই রায়সিনা রোডের বাংলোতে আগেকার দিনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারিরা থাকতো। কিন্তু উপায় কি ? শুধু কি আমরা আছি ? এইতো পাশের বাড়িতে আছেন এইচ· সি· প্যাটেল, ফুড্ সেক্রেটারি। কি করা যাবে ? অর্ধেক বাংলো দখল করে আছেন এমন সব লোক—থাক্ গে, তোর মামা শুনলে রাগ করবেন। তোরা কি আর চিরদিন গোল মার্কেটে থাকবি ? বেশি দিন নিশ্চয় থাকতে হবে না।"

অনুশীলা বুঝল।

ট্যাক্সিতে সুনৃত সান্ত্বনা দিল, "সংসারে সব মেনে নিতে হয়। তাকে পণ্ডিতরা বলেন জ্ঞান, উইজ্ডম। যখন তুমি প্রতিবাদ করবে না, তোমার রাগ থাকবে না, নালিশ করবে না তুমি, শুধু বুঝবে, মানবে, তখন তুমি জ্ঞানী, ওয়াইজ। আমাদের স্বাধীনতা কম বয়সে পেকে গেছে, ওয়াইজ হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ, নালিশ, রাগ, ভুলে গেছি। বিদগ্ধ হয়েছি! এই ১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষের স্লোগান হল, মেনে নাও। প্রতিবাদ কোরো না। সুতরাং প্রিয়ে অনুশীলে, রেগে লাভ নেই, অভিমানে তোমার ক্ষতি, প্রতিবাদের রাস্তা বন্ধ। 'এ· কে· লাহিড়ি আমার মামা'—এ-বাক্য উচ্চারণের আত্মতৃপ্তি তোমার। 'সুনৃত মুখার্জির বৌ অনুশীলা আমার ভাগ্নী—ওরা গোলমার্কেটে থাকে'—এ-স্বীকারোক্তি ওদের কাছে খানিকটা বিস্বাদ।"

পরের দিন সকালে বারান্দায় বসে সুনৃত সংবাদপত্র পড়ছে, সুব্রহ্মনিয়মের সঙ্গে দেখা।

"কাল রাত্রে কিসের সভা হল ?"

"হে, হে। তামিল সংঘের। আমি, হে, হে, সংঘের সেক্রেটারি।"

"অনেক লোকজন এসেছিল।"

"আশি জন। হে, হে। দুজন আই· সি· এস, চার জন এম· পি·।"

"আচ্ছা ? বাৎসরিক সভা বুঝি ?"

"না, না। হে, হে। সাধারণ সাপ্তাহিক সভা। মাদ্রাজ থেকে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এসেছেন—ওয়াই. পি· সুন্দরশঙ্করম—তাঁর

বক্তৃতা ছিল। আহা কি সুন্দর বললেন। হে হে।"

"তামিল আই. সি. এস.-রা পন্ডিতদের বক্তৃতা শোনবার সময় পান ?" মনে মনে আরও প্রশ্ন করল, "আর, তার জন্যে কেরানির বাড়িতে এসে সতরঞ্চিতে বসেন ?"

"হে, হে। কেন পাবেন না ?"

সুব্রহ্মনিয়ম মানুষটার বয়স যা হোক না কেন, একমাথা সাদা চুলে বেশি দেখায়। কিন্তু শুভ্রকেশ সত্ত্বেও দেহ ঋজু ও মজবুত, ঝকঝকে দাঁত নিরোগ, ত্বক অকুঞ্চিত! চেহারার এই পরস্পরবিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব, সুব্রহ্মনিয়মের জীবন-ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। দেখে সহজে বোঝার উপায় নেই বয়স বিয়াল্লিশ না বাহান্ন। সুনৃত অবিশ্যি জানে, কম সংখ্যক দাক্ষিণী মানুষই সরকারী খাতায় প্রকৃত বয়স ঘোষণা করে। সুব্রহ্মনিয়মের বয়সের মত, প্রকৃত মনোভাবও সহজে বোঝা শক্ত। প্রতি বাক্যকে অন্তত দুবার সে পাম্প করা হাস্যে সিঞ্চিত করে। হাসি আর ভেতর থেকে আসে না, মুখগহ্বরে জ'মে বদনে ফুরোয়। নিজগৃহে সুব্রহ্মনিয়ম হাসে না, সেখানে গম্ভীর ওজনদার স্বামী, কর্তব্য-কঠোর পিতা। গৃহে সুব্রহ্মনিয়ম সিগারেট পর্যন্ত খায় না, বাইরে এক পেগ হুইস্কির লোভ সামলাতে কষ্ট হয়। গোলগাল ভরপুর মুখমণ্ডলে তাকালে মনে হয় যা নেই তা, চিবুক।

অধিকাংশ তামিল ব্রাহ্মণের মত সুব্রহ্মনিয়ম ঘোরতর সংসারী। সকালে উঠে দুধ আনতে যায়। যখন ফিরে আসে তখন প্রথম প্রভাত। ইতিমধ্যে ধর্মপত্নী অম্বা স্নান সেরে কফির জল চাপিয়েছেন। সুব্রহ্মনিয়মের দুই কন্যা, তিন পুত্র। বড় মেয়ে রত্না বি. এ. পড়ে। বড় ছেলে প্রি-মেডিক্যাল। বাকি সব মাদ্রাজি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে। কনিষ্ঠা কন্যা উমা সুনৃত-তনয়া মিলির সহচরী।

স্নানান্তে সুব্রহ্মনিয়ম মিনিট দশ পূজা করে। তারপর সন্তানদের পড়ায়, ধর্মপত্নীকে রান্নায় পরামর্শ দেয়। অনেক সময় নিজেই কারী বা আভিয়াল রান্না করে। ভাল কিছু রান্না তার পর্যবেক্ষণ ছাড়া সম্পন্ন করবার হুকুম নেই। সুব্রহ্মনিয়ম বেশ আগে আপিস যায়, ফেরে দেরি করে। সপ্তাহে দু'দিন বাজার করে। রাত্রে রোজ নিয়মিত সন্তানদের পড়ায়। আহারান্তে ধর্মপত্নীকে নিকটে আহ্বান করে

রোজকার হিসেব লেখে। শোবার আগে প্রত্যেক দরজার ছিটকিনি নিজের হাতে বন্ধ করে।

মাইনে পর্যাপ্ত না হলেও সুব্রহ্মনিয়ম প্রতি মাসে কিছু সঞ্চয় করে। তামিল জীবনদর্শন অসঞ্চয়ের মত অন্যায় নেই। মানুষ অভাব ও চাহিদাকে শাসন করতে পারে, তাই সে জীবশ্রেষ্ঠ ! সঞ্চয় সভ্যতার জনক। মানুষ যদি জীবনের উপার্জন সব খরচ করে দিত তাহলে সভ্যতা গড়ে উঠত না। সুব্রহ্মনিয়ম সংসারের সারটুকু বেশি বোঝে। সাতজনের সংসারে খরচ কম নয়। জিনিসপত্রের দামও একমাস একস্থানে থাকে না, সর্বদা ঊর্ধ্ব-গতি। তথাপি তিনশ টাকার পরে সুব্রহ্মনিয়ম মাইনে-বাড়ার কথা দৃঢ় সংকল্পে বিস্মৃত হয়েছে। তা না হলে সঞ্চয় অসম্ভব। দিল্লীর মত অলীক শহরে টাকার চাপ বড় বেশি। তাই আত্মশাসনের প্রয়োজনও বেশি। বড় দুই ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যয় অনেক, সেখানে সংক্ষেপের রাস্তা নেই। ছোট তিন সন্তানকে মাদ্রাজি স্কুলে পাঠায়— নিরানব্বুই ভাগ তামিল যা করে—একজনের মাইনে লাগে না। আহারে, পোশাকে, ব্যসন-বিলাসিতায় যতটা সম্ভব কড়াকড়ি করতে হয়। এ-বাজারে, সুব্রহ্মনিয়ম তিনবার হেসে বলে, পরিবার ম্যানেজ করা গভর্নমেন্ট চালানোর চেয়ে শক্ত।

অবশ্য এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগিতা সে পায় ধর্মপত্নী অম্বার কাছে ! তিনি সাবেকী তামিল রমণী, জীবনকে গভীর কৃচ্ছ্র-সাধনের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। দ্রাবিড় কাদায় কাছা দিয়ে শাড়ি পরেন, নাকে-হীরের নথ, কণ্ঠে সোনা-বাঁধানো মঙ্গলসূত্রম ! তাঁর চাহিদা এত কম যে সুব্রহ্মনিয়ম অনেক সময় বুঝতে পারে না তিনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে, স্বামীর এক পয়সা খরচ হয় নি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করেন ; চাকর তো দূরের কথা—তামিল পরিবার বড় একটা চাকর রাখা হয় না— বাসন মাজার লোক পর্যন্ত তাঁর দরকার হয় না। অথচ কয়েক গ্লাস কফি, দুথালা সাদম (ভাত) একটু বেশি মরু পেলেই তাঁর দেহের প্রয়োজন মিটে যায়। সুব্রহ্মনিয়ম স্মরণ করতে পারে না

অম্বার দেহাতীত দাবি কোনও দিন ছিল কিনা।

সুব্রহ্মনিয়ম নিজে ঘন কালো, অম্বা কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু বড় মেয়ে রত্না হঠাৎ ফর্সা। সুব্রহ্মনিয়মের বন্ধুরা এ নিয়ে প্রশ্ন করলে সে সহাস্য উত্তর দেয়, "স্লেট কালো, পেনসিল কালো, হে হে, কিন্তু ঘর্ষণে যে-রেখা উৎপন্ন হয় তা সাদা, হে হে।" রত্না ক্ষীণাঙ্গী, মাঝারি দৈর্ঘ, সবসুদ্ধ দেখতে বেশ। এবার সে উনিশে পড়েছে। সব তামিল পরিবারের মত সুব্রহ্মনিয়ম রত্না ও দুই ছোট মেয়ের সঙ্গীত-শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছে। রত্না ঠিক সুকণ্ঠী নয়, কিন্তু সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতা নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছে। ত্যাগরাজার, ভজন, ভারতীয় গীতিও সে ভালই গায়। দক্ষিণ ভারতীয় অনুষ্ঠানে রত্না গাইবার নিমন্ত্রণ পায়। মঞ্চের মধ্যস্থলে রত্না মাইকের সামনে গান ধরে ; অদূরে উপবিষ্ট সুব্রহ্মনিয়ম সমঝদারের মত মস্তক সঞ্চালন করে। মঞ্চে তার অপ্রয়োজনীয় কমিক উপস্থিতিতে বিরক্ত হলেও উদ্যোক্তারা জানে, রত্নার গান শোনাতে হলে সুব্রহ্মনিয়মকে স্টেজে বসতে দিতে হবে।

সুব্রহ্মনিয়ম নিজের গ্রাম-শহর থেকে তের-চৌদ্দশ মাইল দূরে দিল্লীর ধুলোয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি যে একেবারে উড়িয়ে দেয় নি তার প্রমাণ মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে সে ইতিমধ্যে একখানা ছোট্ট বাড়ি করেছে। তথাপি এখন আর সে পুরো তামিল নেই। মাদ্রাজে গিয়ে সে আর পুরোপুরি খাপ খায় না। বন্ধুমহলে সে বলে, "আমি তো হিন্দুস্থানী হয়ে গেছি হে হে।"

আসলে যেটুকু পরিবর্তন তার বাইরের জীবনে এসেছে তাকে সে উত্তর-ভারতীয় বন্ধুমহলে বড় করে দেখায়। ভেতরে সে পরিপূর্ণ সাবেকী। যে-সকল 'আধুনিক' সমস্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, তামিল-জীবনে তার দাপট এখনও সীমিত। একেবারে নেই তা নয় ; যা আছে, শাসনের মধ্যে। প্রাচীন জীবনরীতির প্রভাব এখনও বহুলাংশে অটুট ; প্রাচীন সংস্কারে, রীতি-নীতিতে তামিল-সমাজ এখনও সন্নিবদ্ধ। তামিল জীবনের আপাত-মসৃণতার অন্যতম প্রধান কারণ উত্তরাধিকার প্রথা। স্থাবর সম্পত্তিতে প্রত্যেক সন্তানের অধিকার স্বীকৃত ; পিতা সমস্ত

পরিবারের অভিভাবক মাত্র, স্বেচ্ছাচারী নন। এজন্যে ভূসম্পত্তি তামিলনাদে টুকরো টুকরো হয় নি, যেমন হয়েছে উত্তর ভারতে। আধুনিক কালেও যৌথ-পরিবার ভেঙে যায় নি। এক পরিবারের চার ছেলে ভারতবর্ষের চার শহরে চাকরি করে : উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত পাঠায় পিতৃ-সকাশে ; পিতা তার চতুর বিনিয়োগে ভূমি কেনেন, বাড়ি তৈরি করেন, সম্পত্তি বাড়ান। পারিবারিক জীবনে প্রাচীনের প্রভাব এখনও অম্লান। ভিত্তি শক্ত, গভীর-শিকড়। তাই আধুনিকতার ধাক্কায় ভেঙে পড়ে নি, সামলে নিতে পারছে। পরিবর্তনের বন্যাকে অধিকাংশ তামিল নিস্তরঙ্গ সরোবরে পরিণত করে নিয়েছে। ভেসে যায় নি।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা তামিল জীবনে এসেছে গত পঁচিশ বছরে তা হল অব্রাহ্মণের ক্ষমতা লাভ। শতসহস্র বছর তামিল ব্রাহ্মণ, সংখ্যালঘু হয়েও, বুদ্ধি, বিদ্যা, বিচক্ষণতার জোরে সমাজ শাসন করে এসেছিল। ইংরেজের পদসঞ্চার মাদ্রাজে প্রথমে হলেও তামিল ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে আগন্তুক বিদেশীর সঙ্গে বুদ্ধির মিতালি পাতায় নি ; সে-ভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বঙ্গের বুদ্ধিমানদের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বঙ্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন সে ইংরেজি শিখতে শুরু করল, প্রতিষ্ঠা পেল অনায়াসে। স্বাধীনতার আন্দোলনেও সে যোগ দিল। কিন্তু সবটাই রয়ে সয়ে, প্লাবনের ডাকে নয়। তাই বিগত শতাব্দীতে তামিলনাদে এমন কোন ভাববন্যা আসে নি যা প্রাচীনকে সত্যিকারের দুর্বল করেছে। এমন কোন নেতা পর্যন্ত আবির্ভূত হন নি যিনি প্রত্যেক তামিল অন্তরকে গভীর করে নাড়া দিতে পেরেছেন। তামিলনাদ বিবেকানন্দকে সম্মান করেছে, জন্ম দেয় নি। তারা ধর্মনেতা চৈতন্য-রামকৃষ্ণ নয়, শঙ্করাচার্য। রাজনীতিতে সে চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, গান্ধী সৃষ্টি করে নি, বড় জোর রাজাগোপালাচারী নির্মাণ করেছে।

এক-মানুষ এক-ভোট মন্ত্র নিয়ে গণতন্ত্র আসবার সঙ্গে সঙ্গে তামিলনাদে ব্রাহ্মণ-শাসনের অবসান হল। অব্রাহ্মণরা রাজত্ব পেয়ে অতীতের হিসেব মেলাতে বসল। ব্রাহ্মণদের জন্যে চাকরির দরজাই কেবল বন্ধ হল না, স্কুল-কলেজের দরজাও প্রায় বন্ধ হল। তামিল

ব্রাহ্মণকে বাধ্য হয়ে আরও অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হতে হল। কিন্তু অব্রাহ্মণ শাসনও কোনও সামাজিক বিপ্লব আনল না। সে প্রেরণা তার মধ্যে কোন দিন ছিল না। ব্রাহ্মণকে জব্দ করে অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ-জীবনের অনুকরণ শুরু করল। তাতে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কমল, সম্মান বাড়ল।

সুব্রহ্মনিয়মের নকল-হাসির অন্তরালে যে সূক্ষ্ম চতুর মন, তাতে ব্রাহ্মণত্বের ধারাবাহিক শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা সদা জাগ্রত। তামিল সমাজের চিরজয়ী প্রাচীনতায় সে গর্বিত। কথাবার্তায় বার বার সে বুঝিয়ে দেয়, তোমরা যা পায়ো নি, আমরা পেরেছি। তোমরা অস্থির অনিশ্চিত, পরিবর্তনের চাকায় নিষ্পেষিত ; আমরা সুস্থির, সুনিশ্চিত, পরিবর্তন হজম করার শক্তিতে বলবান। তোমরা শুধু নোকরি নয়, গৃহের জন্যেও, সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমরা যেখানেই না কর্ম করি, অন্তর আমাদের পড়ে থাকে তামিলনাদে, আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে আঞ্চলিক। তোমাদের জীবনে বহু দ্রব্যের বহু ভাবনার নিরন্তর উদ্বেল সংমিশ্রণ ; আমরা অনেকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমরা ভাবো ব্রাহ্মণ বলে তামিলনাদে আমাদের স্থান নেই! গিয়ে দেখে এসো, অব্রাহ্মণ সবাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যে কি রকম দৌড়-ঝাঁপ করছে!

এ-হেন সুব্রহ্মনিয়ম যখন এক সন্ধ্যায় সুনৃতের কাছে এসে হাজির হল, সুনৃত যেমন সচকিত হল, তেমনি অবাক।

"প্রায়ই ভাবি, মিঃ মুখার্জি একদিন এসে একটু গালগল্প করবো হে হে। কিন্তু সময় একেবারে পাই নে।"

"তা তো বটেই," সুনৃত মেনে নিল। "সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত।"

"তা বলে কি সমাজ বলে কিছু থাকবে না? প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খোঁজ করবে না! হে হে! সরকার আমাদের জীবনকে এমন ভাবে গ্রাস করে রেখেছে, মিঃ মুখার্জি, হে হে।"

"তা যা বলেছেন," সুনৃত সাবধানে মন্তব্য করল।

"আমার কথা একটু আলাদা। সেকশন অফিসার থেকে আন্ডার সেক্রেটারি পর্যন্ত, আমাকে না হলে একমুহূর্ত চলে না, হে হে।

মাঝে মাঝে ডেপুটি ডেক্রেটারি পর্যন্ত ডেকে পাঠান।"

"তা হলে তো আপনার একেবারে সময় নেই।"

"এই তো গেল অপিসের কাজ. হে হে। তারপর তামিস্র সংঘ আছে না? তারও কি দাবি কম নাকি? তা ছাড়া বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা দেখতে হয়, সংসারের দাবি মেটাতে হয়। পুরুষমাত্রেই এক একটা মাল্টি-পারপাস প্রজেক্ট, হে হে।

"পুরুষমাত্রেই মহাপুরুষ।"

"যা বলেছেন, হে হে। আপনার তো একটি মাত্র কন্যা। লেখাপড়ার পর্ব এখনও আসে নি। নতুন সংসার, ঝামেলা কম। সংসার, জানেন মিঃ মুখার্জি, মাটি। প্রথম প্রথম অল্প কর্ষণে ফসল বিস্তর। পুরানো হয়ে গেলে যতোই কর্ষণ করুণ আবাদ হতে চায় না, হে হে।"

"সার ঢালতে হয়।"

"হবেই। হে হে। কিন্তু সার পাচ্ছেন কোথায়? অন্তঃসার-হীন জীবনে সার পাচ্ছেন কোথায়?"

"তা বটে।"

"কিন্তু না পেলে তো চলে না. চলবে না। হে হে। সার আনতেই হবে। এখন কথা হল, কোত্থেকে আনবেন, কি করে আনবেন। হে হে। চুপ করে আছেন যে। বড় কঠিন প্রশ্ন, না?"

"আমার তো নতুন মাটি।"

"হে হে হে হে। তাই তো সমস্যাটা আপনার নয়, আমাদের। আজকের দিনে, বুঝলেন মিঃ মুখার্জি, কোন সমস্যাই একা একা মেটানো যায় না।"

"মেটানো শক্ত।"

"বন্ধুবান্ধব পাড়া-পড়শীর সাহায্য চাই।"

সুনৃত বুঝল, এবার সুব্রহ্মনিয়ম বাক্যালাপের চাকা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে আসছে।

"বুঝলেন মিঃ মুখার্জি, এমন একটি সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার কাছে? কেন? আমি কি কোনও কাজে লাগতে

পারবো ?"

"অবশ্য, সবাই বলে আপনি বুদ্ধিমান, ধীর-স্থির লোক। তা ছাড়া আপনি একজন অফিসার। এ পাড়ার সত্যিকারের লোক নন আপনি। দুদিনের অতিথি, হে হে। আপনাকে সবাই সম্মান করে।"

পাশের ঘরে অনুশীলা সুব্রহ্মনিয়মের উচ্চকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল। তার সদ্য-উচ্চারিত বাক্যে সে প্রীত হল।

সুনৃত বলল, "তাই নাকি ?"

"নিশ্চয়। তা না হলে আমি এসেছি কেন ?"

"যখন এসেছেন তখন বলুন আপনার সমস্যাটা কি ?"

"বলছি। এমন কিছু বড় সমস্যা নয়, হে হে। আমি নিজেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু মনে হল আপনার সমর্থন পেলে উত্তম।"

"কিসের সমস্যা ?"

"দেখুন মিঃ মুখার্জি, এ-পাড়ায় আপনি নতুন এসেছেন। মার্চে এসেছেন. এখন আগস্ট, মাত্র ছ'মাস। পাড়ার বিশেষ কিছু খবর আপনি রাখেন না।"

সুনৃত মনে মনে বলল, অনুশীলার দাক্ষিণ্যে একেবারে কমই বা কি রাখি!

"আর রাখবেনই বা কেন ? এ-পাড়ার লোক আপনি নন।"

"এখানে আমার বেশ ভালো লাগছে", সুনৃত উদার হল।

"তা তো বলবেনই। আসলে এ-পাড়াটা কি জানেন ?"

"কি ?"

"নোংরা। হে হে। আমি কোদালকে কোদাল বলতে ভয় পাই নে।"

"কেন পাবেন ?"

"কেন পাবো, বলুন! তাই বলছিলাম পাড়াটা ভালো নয়। এই যে আপনার পাশেই থাকে সিন্ধীরা, এদের কেলেঙ্কারি শুনলে আপনি অবাক হবেন। আমি কারুর কুৎসা করতে চাই নে, হে হে। কিন্তু যা সব আমরা চোখে দেখেছি তা আপনাকে বলতে পারবো না।"

"তা হলে না বললেন।"

"আপনার অতি নিকটতম প্রতিবেশীর কথাই ধরুন না।"

"কেন? তাঁদের আবার কি হল?"

"না, কিছু হয় নি, হে হে। ঐ যে পাঞ্জাবি লোকটা পালিয়ে গেল, মুমূর্ষু বাপকে ফেলে, এর পেছনে কি কোনও রহস্যময় ইতিহাস নেই?"

"আছে নাকি?"

"কেউ বলছে, বৌটাকে নাকি পার্টিশনের সময় মুসলমানরা ধরে নিয়ে তিন বছর রেখে দিয়েছিল। আবার কেউ বলছে, ওরা স্বামী-স্ত্রীই নয়।"

"তাও বলছে?"

"বলছে বৈকি! হে হে। তামারও তাই মনে হয়। শুনছি, মেয়েটার শ্বশুর ছিল না বুড়ো, বাপ ছিল। লোকটা যতদিন পেরেছে টেনেছে, তারপর সট্‌কেছে।"

"তা হবে।"

"ঐ যে কোণের সর্দারের বাড়ি, ওদের ব্যাপার জানেন তো? ওরা এখন মস্ত ধনী, হে হে। লোকটা আসলে স্টেনোগ্রাফার। কনট্রাকটারি করে পয়সা করেছে। লোকে বলে, বৌ ভাঙিয়ে।"

সুনীত বলল, "দশ রকম লোক নিয়ে সমাজ! আমরা সবাই কাচঘরে বাস করি।"

"সে কথা মানবো কেন, মিঃ মুখার্জি! আমি কাচঘরে বাস করিনে, হে হে। আপনিও করেন না।"

"অত জোর গলায় বললে কেমন সন্দেহ হয়, মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম।"

"হে হে। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন, কাচঘরে বাস না করলেও ঢিল আপনার ঘরে পড়বেই।"

"পড়েছে বুঝি?"

সুব্রহ্মনিয়ামের গোল মুখ গম্ভীর হল।

"সে জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।"

"কি হয়েছে?"

"আপনি জানেন আমার মেয়ে রত্না কলেজে পড়ে।"

"জানলাম !"

"খুব ভাল মেয়ে। শান্ত, ধীর, নম্র, বাধ্য, সুশীলা।"

"দেখতেও তো বেশ।"

"খুব সুন্দরী না হলেও, মন্দ নয়। বন্ধুরা আমাকে এজন্যে হিংসে করে। বলে, 'তুমি কালো, তোমার স্ত্রী কালো, মেয়ে কি করে এত ফর্সা হল!' আমি বলি স্লেট কালো, পেন্সিল কালো, দাগ কাটলে সাদা কি করে হয়? হে হে।"

"ভালোই বলেন। আপনার মেয়ের পেছনে কেউ লেগেছে বুঝি?"

"না, ঠিক পেছনে লাগা নয়। রত্না তেজস্বী মেয়ে, কাউকে পেছনে লাগতে দেবে না। কিন্তু উৎপাত করছে।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন, বাস-স্ট্যান্ডে রত্নার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা; যাবার সময় ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে যাওয়া যে আমি যাচ্ছি: এমন কি, এটাই সবচেয়ে গুরুতর, চিঠি লেখা।"

"চিঠিও লিখছে?"

"রত্না নয়।"

"বুঝেছি। ছেলেটি কে?"

"আপনাকে বলব বলেই তো এসেছি। মিঃ সান্যালের বড় ছেলে।"

সুনৃতের মনে পড়ল। সান্যালবাড়ির সঙ্গে তার মেলামেশা একেবারে নেই, তবু সে শুনেছে সান্যাল মশায়'র বড় ছেলেটি মেধাবী। দেখতে শুনতেও বেশ। চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত। প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছে।

"ছেলেটি তো ভাল শুনেছি।"

"তাতেই তো বিপদ। বাজে ছেলে হলে ধরে মার লাগাতাম। চুকে যেত, হে হে। এসব ভাল ছেলেরা যখন বখামি করে তখন বিপদ আরও বেশি। মেয়েরা সরল মনে ওদের ভালটাই দেখে, মন্দের খোঁজ রাখে না।"

"চিঠি লেখে আপনি জানলেন কি করে?"

"হাতে-নাতে ধরে ফেললাম ! এই দেখুন তার প্রমাণ।"

সুব্রহ্মনিয়ম পকেট থেকে বার করল ডাকঘর-চিহ্নিত খাম। সুনৃতের হাতে দিল। সুনৃত প্রথম একবার ভাবল, দুটি তরুণ-তরুণীর আদান-প্রদানে উঁকি মারা অন্যায় হবে। পরে ভাবল, চিঠি না দেখলে সুব্রহ্মনিয়ম ভাববে বাঙ্গালি বলে সে সান্যালের ছেলের পক্ষ নিচ্ছে।

খুলে দেখল। ছোট্ট ছ'লাইনের নির্দোষ পত্র। "তুমি ইকনমিক্সের যে বইটে চেয়েছিলে আমি গতকাল য়ুনিভারসিটি লাইব্রেরীতে ফেরত দিয়েছি। চট করে নিয়ে নিও, নয়তো অন্য হাতে চলে যাবে। বাকী বই দুটো আমি পরে জোগাড় করে দেব। এক বন্ধুর সঙ্গে দুদিনের জন্যে আম্বালা যাচ্ছি। তাই চিঠি লিখলাম।" সুনৃত পত্রশেষে নাম পড়ল 'সুভগ সান্যাল'। মনে মনে ভাবল, বেশ নাম তো।

"একেবারে নির্দোষ," মন্তব্য করল সুনৃত।

"নির্দোষ বলেই তো বিপদ! দোষ থাকলে এক্ষুনি ছোকরাকে ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসতাম। কিন্তু এই সব ট্যাকটিক্স তো আমাদের জানা আছে। বই-দিয়ে যে আদান-প্রদানের শুরু তার শেষ কোথায় আমরা কি জানি নে?"

"বৌ চেয়ে।"

"সেটাই তো বন্ধ করতে চাই। আমরা তামিল ব্রাহ্মণ। আমাদের সমাজে এমন আধুনিকতা অচল।"

"আপনার মেয়ে কি বলে?"

বলে, একটু আলাপ আছে, বই-পত্র দিয়ে সাহায্য করে, ব্যস।"

"তাহলে ভাবছেন কেন?"

"ভাববো না? আপনার মেয়ে বড় হলে বুঝবেন।"

"মেয়েকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন, বিপদ কেটে যাবে।"

"তা কি কম বুঝিয়েছি? প্রতিজ্ঞা করেছে, আর মিশবে না।"

"তবে আর ভাবনা কিসের?"

"আপনি একবার ছেলেটাকে ডেকে বুঝিয়ে দিন!"

"পাগল হয়েছেন! আমার ছোট ভাই-এর বয়সী, কোনদিন একটা কথা হয় নি, হঠাৎ ডেকে বলব, এই ছোকরা, ও-বাড়ির মেয়ের

সঙ্গে মিশো না! এ কি হয়?"

"কেন হবে না মিঃ মুখার্জি! এ-পাড়ায় আপনি একজন অফিসর। আমাদের ভাল-মন্দ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে আপনার।"

"আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েকে য়ুনিভারসিটিতে পাঠাচেছন। বি. এ. পড়ছে। সে যদি কারুর সঙ্গে ভাব করে তো আপত্তি কিসের? অবশ্য, ছেলে যদি ভাল হয়।"

"আপত্তি নেই? আপনি বলছেন কি? এর পরিণাম তো ভাল নয়! মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তাকে ঘর-সংসার করতে হবে।"

"অর্থাৎ বিয়ে আপনি দেবেন, সে করবে না।"

"অবশ্য।"

"যদি সে করে?"

"সে করবে না। করতে পারে না।" গোল চিবুকহীন মুখে থমথমে কালো মেঘ। অতি কষ্টে বজ্র সামলে রাখছে।

সুনৃত ভাবল, লোকটার প্রত্যয় আছে। সমাজ, সংসারকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। হয়তো ওর জীবনটাই এ-বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে।

"মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম, আপনি নিশ্চয় কাউকে ভালবাসেন নি।"

সুব্রহ্মনিয়ম হতভম্ব হয়ে গেল; ভালবাসা! প্রেম! কোনদিনও নিজেকে সে এমন অন্যায় অসংযত অশালীন প্রশ্ন করে নি। অল্প বয়সে মাতৃকুলের জানাশোনা মেয়ে অম্বার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। তখন সে আঠার, অম্বা আট। চার বছর বাপের বাড়ি কাটিয়ে 'তেরাক্ষী' হবার পরে পতিগৃহে এসেছিল। 'শান্তি-কল্যাণম্' হবার পরেও কয়েক বছর স্ত্রীকে সে বিশেষ পায়নি। অম্বা ভয়ে কাঠ হয়ে যেতো। সুব্রহ্মনিয়ামের মা তাকে নিজের কাছে শোওয়াতেন। সুব্রহ্মনিয়ম স্ত্রীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। শুধু চোখের সামনে ফুটে উঠল ধারাবাহিক অন্ধকার।

"বাসেন নি তো!" সুনৃত যোগ দিল। "তাই চান না, আর কেউ ভালবাসুক।"

"এ-আপনি কি বললেন, মিঃ মুখার্জি, হে হে। এসব কি সত্যিকারের ভালবাসা? এসব হল প্রথম যৌবনের চুলকানি।

আপনি একে প্রশ্রয় দেন ?"

"প্রশ্রয় দেবার প্রশ্ন ওঠে না। আপনি যদি চান রত্না সুভগের সঙ্গে না মিশুক. ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন. বুদ্ধিমতী মেয়ে. বুঝবে। যদি তাতে কাজ না হয়. তাহলে অবস্থা কিঞ্চিত গুরুতর। তখন হয় আপনাকে কলেজ ছাড়িয়ে মেয়ের অবিলম্বে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো··· ।"

বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভাবতে সুব্রহ্মনিয়মের মাথা ঘুরে গেল।

"নয়তো কি ? নয়তো কিছুই নয়!" চেঁচিয়ে উঠল সে। "আমার মেয়েকে আমি সামলাব। আপনি একটু এদিকে নজর রাখুন। ছেলেটাকে একবার বলে দিন।"

মায়া হয় সুনৃতের। বলল, "আচ্ছা, দেখি। সুযোগ যদি হয়, মনে রাখবো ।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমি জানি আপনি চুপ করে থাকবেন না।" সুব্রহ্মনিয়ম উঠল। "নমস্কারম্।"

"নমস্কারম্", হাত জোড় করল সুনৃত। "বিশেষ ভাববেন না। এমন কিছু গুরুতর নয় ব্যাপারটা। হয়তো কিছুই নয়।"

"কি জানি!" চলতে চলতে সুব্রহ্মনিয়ম বলল, "হয়তো অনেক কিছু।"

এ সাক্ষাৎকারের সপ্তাহ দুই পরে কর্মোপলক্ষে সুনৃতকে পুরাতন দিল্লীর সিভিল লাইনস-এ যেতে হল। এদিকে গেলে য়ুনিভারসিটির কাছাকাছি রীজে একবার সে বেড়িয়ে আসে; পরিবেশ বড় ভাল লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সবগুলি কলেজ য়ুনিভারসিটি এলাকায়। রীজের বনসবুজ লোকবিরল নির্জনতায় ছেলেমেয়েরা ক্লাসের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়. কেউ বা গাছতলায়. পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়ে। সুনৃতের বড় ভাল লাগে যৌবনের এই নিশ্চিন্ত ভাববিলাস দেখতে, যা সে চিরদিনের জন্যে দূরায়মান পশ্চাতে ফেলে এসেছে।

সেদিন রীজের রাস্তায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সুনৃতের দুটি দৃশ্য চোখে পড়ল, অর্থপূর্ণ রহস্যে সে চমকিত হল।

সুনৃত দেখল, ফ্ল্যাগ-স্টাফের সংলগ্ন যে ছোট্ট সুন্দর পার্কটি তাকে দেখা হলেই আহ্বান করে, সেখানে একখানা বেঞ্চিতে মুখোমুখি দুটি ছেলেমেয়ে বসে আছে। তাদের মাঝখানে একখানা খোলা বই। কিন্তু তাদের দৃষ্টি মিলনোন্মুখ দুস্তর-ব্যবধানে-কাতর দুই ব্যথাতুরা পৃথিবীর অন্তর্ভেদ করছে।

মেয়েটি রত্না সুব্রহ্মনিয়ম।—ছেলেটি সুভগ সান্যাল।

হাসি পেল সুনৃতের, খুশিতে, বিদ্রূপে। খুশি হল যৌবনের সার্থক অভিযানে। যৌবন চিরদিন বেড়া ভাঙবে, বন্ধন কাটবে, তৈরি করবে নতুন পথ, জয় করবে নতুন জগৎ। শাসন মানবে না, অবরোধ অগ্রাহ্য করবে, শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে কাটবে।

বিদ্রূপ জাগল মনে সুব্রহ্মনিয়মের কথা ভেবে। হায় রে হায়, অমন যে চীনের-দেয়াল-ঘেরা সাবেকী তামিল সমাজ তাতেও যুগের পরিবর্তন অনুপ্রবেশ করেছে। নিয়মের শাসন টলছে, সংস্কারের শাসানি টিকছে না।

দুঃখও হল। দুঃখ হল সুব্রহ্মনিয়মের কথা ভেবে ; বেচারী কোনদিন ভালবাসে নি। ওর মনের জানালা ভেঙে আকাশ আসে নি। সমুদ্রের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ে নি ওর বুকে। জীবনের কূপ কোনও দিন মহাসাগর হয় নি।

দুঃখ হল নিজের জন্যেও। পেছনে-ফেলে-আসা তীক্ষ্ণপ্রবাহিনী ঝরনার বিলীয়মান কলস্বর ক্ষণিকের জন্যে শুনতে পেল সুনৃত। সে পলাতকা শুধু বলছে, আমি নেই, নেই, নেই।

চলতে চলতে রীজের প্রান্তে এসে পড়ল সুনৃত। এবার দেখল দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুউচ্চ শালগাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। দাঁড়িয়ে আছে দূরের পানে তাকিয়ে। অপলক, স্তব্ধ তার দৃষ্টি। চতুর্দিকের কিছু সে দেখছে না।

ছেলেটিকে চিনল সুনৃত। পাশের বাড়ির সন্তোষ।

তার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে পিচ-ঢালা রাস্তার শেষ প্রান্তে আর একটি শরীর দেখতে পেল সুনৃত। দূরে—স্থাণু, বেপথুমতী তারা।

দুজনে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। সে-দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী বিবক্ষা। এক পা কেউ নড়ছে না। শুধু দেখছে। প্রাণ ভরে দেখছে।

কাল, ধরিত্রী, জীবন, নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেছে দুজনকে ঘিরে। প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে।

শুধু সেই নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা ভেদ করে বনের কোনও গোপন বৃক্ষশাখায় গান করে উঠছে সুকণ্ঠ কোকিল। বলছে, কাছে এসো। এগিয়ে এসো। কাছে এসো।

জীবনের পরমাশ্চর্য সম্মোহন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে মুক্ত করল সুনৃত। জোর করে পথে পা বাড়াল। মনে তার সুখ-ও-ব্যথার বিস্ময়কর ঐকতান।

মধ্যপঞ্চাশের ভারতবর্ষ, সুনৃত মনে মনে বলল, তুমি তেমনি বিচিত্র, যেমন ছিলে আলেকজান্দারের চোখে, ফা-হিয়েন, বার্ণিয়ের, বাবর, কিপলিং-এর চোখে। তুমি তেমনি বিচিত্র, যেমন তোমাকে দেখেছিলেন বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ। তেমনি তুমি চির-রহস্যময়। শত অন্ধকারেও তুমি আলো আনো, অনেক নিরাশায় তোমার বুকে আশা জেগে ওঠে। শত ভাঙনের মধ্যেও তুমি গড়ে তোল। তোমার চিরকাল-বন্দিত প্রাচীনতার মধ্যেও নতুন বার বার ফুটে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি ভালবাসো! বেড়া ভেঙে, সংস্কার কাটিয়ে, অন্ধকার জয় করে, প্রাচীনতা উপেক্ষা করে, বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন করে, তুমি ভালবাসো।